১৬ এপ্রিল - ৩০ এপ্রিল, ১৯৮৪

# কিশোর মন

## পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

## একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

এখন অনেক বেশি আকর্ষণীয়
হয়ে বেরোচ্ছে

# খেলার আসর

ছবি খেলার আসরের মত আর কোন কাগজে জীবন্ত নয় – এ মত হাজার হাজার পাঠকের। এখন আর শুধু কালো সাদা ছবি নয়, দুই প্রচ্ছদ ছাড়া থাকছে দুটো পুরো পাতা রঙিন ছবি ও দু পাতা জুড়ে রঙিন ব্লো-আপ।

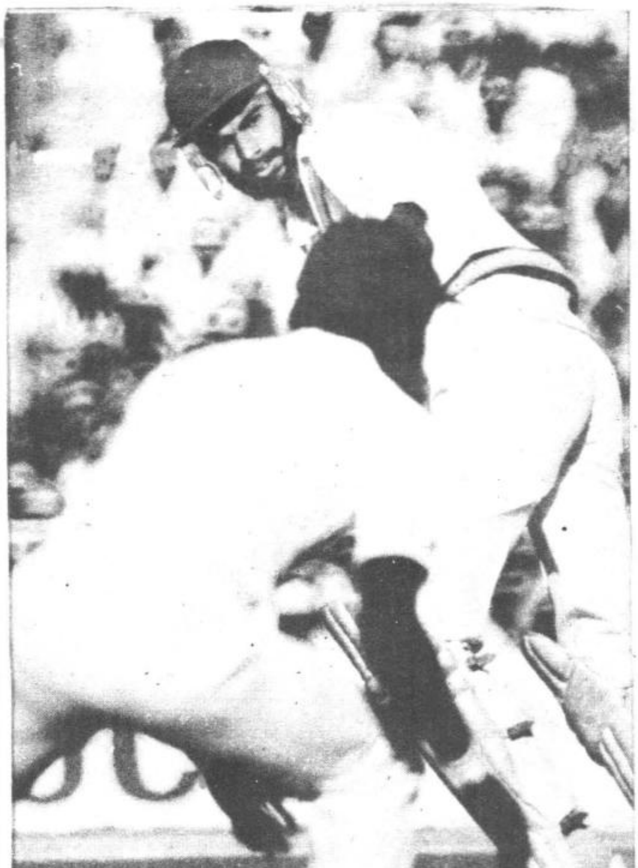

## নতুন বিভাগ

পাঠক পাঠিকাদের বহুদিনের অনুরোধ রাখতে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়েছে – জানাবেন কি ? এই বিভাগে পাঠকদের খেলাধূলা সংক্রান্ত সব রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে।
এছাড়া মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হচ্ছে আরো একটি নতুন বিভাগ – ফুটবল ক্লিনিক। যারা ফুটবল খেলা শুরু করেছেন এমন উঠতি খেলোয়াড়দের সামনে প্রায়ই নানা সমস্যা এসে হাজির হয়। চিঠি লিখে সেই সমস্যার কথা জানালে খেলার আসরের মাধ্যমে সমাধানের পথ বাতলে দেবেন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ চৌধুরী। আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'খেলার আসর' দেখুন।

## বিতর্ক

খেলার আসরের 'বিতর্ক' আবার শুরু হয়েছে। তবে একেবারে নতুন নিয়মে নতুনভাবে। এখন বিতর্ক বেরোয় মাসে একবারই, একটি মাত্র বিষয়ের ওপর। পাঠকদের ছাড়াও ঐ বিষয়ের ওপর থাকে বিশেষজ্ঞের মতামত।
এছাড়া আগেও যে সমস্ত বিভাগ ছিল – পাঠকের কলমে, নানা খবর, মাঠের খবর, দলবদলের খবর – সেগুলো আগের থেকে আরো অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এবং দুটি ধারাবাহিক রচনায় স্পার্তাকিয়াদ থেকে স্পার্তাকিয়াদে এবং লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিকেসর প্রস্তুতি।

মোট ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকা। দাম : দু টাকা।

# কিশোর মন

প্রথম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা
১৬ এপ্রিল—৩০ এপ্রিল ১৯৮৪
দাম ৩ টাকা

## সম্পাদকীয়

প্রিয় কিশোর ভাইবোনেরা !

'কিশোর মন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা তোমাদের হাতে তুলে দেবার পুণ্যলগ্নে এর নেপথ্যের চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন দেখা আর প্রস্তুতির কর্মক্লান্ত দিনগুলির কথাই সবচেয়ে বড় করে মনে আসছে। সে এক মস্ত ইতিহাস। তবু প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার ইতিহাসের মত সে কথা নেপথ্যেই চাপা থাক, তোমরা দেখ এ শিখার উজ্জ্বলতা, দেখ তা কতখানি স্থির, আর দেখ তা কতখানি আলোকিত করতে পেরেছে তোমাদের কিশোর মনকে।

কৈশোর জীবনের এক দুর্লভ সময়। অথচ কৈশোর যেমন অবুঝ, তেমনই সমস্যাময়। মন তখন শৈশবের গুটি কেটে প্রজাপতির মত ডানা মেলবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আর সে শৈশবের দিনগুলির মত মা-বাবা থেকে সারা পৃথিবীর তত্ত্বাবধানে থাকতে চায় না। আর নির্ভরতা নয়—এবার সে হতে চায় স্বয়ম্ভর। এখন তার স্বপ্ন সম্পূর্ণতার—আত্মনির্ভরতার। অথচ বয়স্কদের চোখে সে এখনও ছোট, এখনও অপরিণত। এখানেই বাধে সংঘাত। এই যে পূর্ণতার আভাস অথচ পূর্ণ নয়, এই যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা অথচ অসম্পূর্ণতা—কৈশোরের এই বিশেষ মূল্য না বোঝে কিশোর, না বোঝেন অভিভাবক। কিশোর ভাবতে চায় সে গোটাটা বড়—বয়স্কেরা ভাবতে চান সে গোটাটাই ছোট। এই দোটানায় পড়ে কিশোর মন হয় বিদ্রোহী—সমাজ-সংসার-বন্ধন, রীতিনীতি সব ভেঙ্গে সে কালাপাহাড় হয়ে উঠতে চায়। অথচ তার বুকভরা সুবিশাল সমুদ্রের মত সর্বজনের প্রতি ভালবাসা, তার চোখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তার মেরুদণ্ডে অমিত সংগ্রামের শক্তি। তার এক দাবী, আমাকে বোঝ, আমাকে চেন, আমাকে ভালবাস। আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলতে দাও তোমার অনুভূতি।

আমার ভাইবোনেরা ! আমরা 'কিশোর মন'-এ তোমাদের সেই দাবীর জয়গান গাইব। আমরা এখানে খুলে দেব সেই অনুভূতিরই দরজা। আমরা সহানুভূতি আর সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে চেপে ধরব তোমাদের শক্তিদৃপ্ত মুঠি। 'কিশোর মন'-এর অঙ্গনে সম্মিলিত হক তোমার মন, আমার মন, সকলের মন। আমাদের অতিক্রান্ত কৈশোরের মাঝে তোমাদের সদ্যজাগ্রত কৈশোর পূর্ণ হয়ে উঠুক। জেন, এই বিচ্ছিন্ন দুই মনের পৃথক পৃথক শক্তি যখন সম্মিলিত হবে, সে হবে দুর্জয়। এক মনের চেয়ে দুই মনের শক্তি অনেক বড়। সেই শক্তিতে দুর্জয় হবে কিশোর মন।

সম্পাদক :
অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক :
ডঃ নীরদ হাজরা
শিল্প নির্দেশক :
নিতাই ঘোষ

প্রচ্ছদ : অর্ধেন্দু রায়

## সূচীপত্র

নিষ্ঠুর পৃথিবীতে পরম উপলব্ধির করুণ মধুর উপন্যাস
দূর ফুলের গন্ধ……শিশিরকুমার মজুমদার ১৬
কৈশোরের দুঃখ সুখের গল্প
বাগাল বদনা……অশোককুমার সেনগুপ্ত / ৪
অকপট প্রতিশোধের কাহিনী
পালা বদল……ধীরেন্দ্রলাল ধর / ৪০
হাল্কা হাসির মজার কথা
চালাকির দ্বারা……পার্থ চট্টোপাধ্যায় / ৪৫
মানুষ হওয়ার রূপকথা
পাথরের মুখ……মঞ্জিল সেন / ৫২
অতীত দিনের মুখর খবর
কলকাতার প্রথম ডাকঘর……সুভাষ সমাজদার / ৯
বিজ্ঞানের চোখে ইতিকথা
সাহারার অতীত প্রাণী……সমরজিৎ কর / ৭
বিজ্ঞানের খাসমহলে
কম্পিউটারের জন্মরহস্য……অশোক সেনগুপ্ত / ৩৪
স্বাধীনতার স্বপ্নে রঙিন
লক্ষ্যভেদ……নারায়ণচন্দ্র চন্দ / ৪২
ভাষা নিয়ে ভাবনা
চাই শব্দ···শব্দ চাই / ৩৭
বানান নিয়ে নানান কথা
'প্রতিযোগীতা' দিয়ে শুরু……পলাশ মিত্র / ৪৭
সাংবাদিকের বিস্ময়
জন এফ কেনেডি হাইস্কুল……চিরঞ্জীব / ৫৯
কৃতী কিশোর
যন্ত্রসঙ্গীতের বিস্ময়কর প্রতিভা সন্তোষ সিনহা……
বিনোদ কুমার / ৫৭
হাতে কলমে
অটোম্যাটিক আলো……দিলীপকুমার পাঠক / ৬১
কিশোর মনের প্রাঙ্গণে
এযুগের কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল / ৫৬
সন্ধানা
শব্দচিন্তা……রুবি ভট্টাচার্য / ৬০
জানা প্রশ্ন : অজানা উত্তর……চন্দনকুমার নাগ / ৬০
চোখের ভুল……শংকর মজুমদার / ৬০
মজার পাতা
শয়তানের চেলা……ধীরেন বিশ্বাস / ৬৪
ছড়া ও কবিতা
কিশোর মন···হরেন ঘটক / ১৩, কাঠপুতুলের ছড়া···সরল দে / ১৩, সেই তো আমার···রেবন্ত গোস্বামী / ৪৯, সন্দেহ···শমীন্দ্র ভৌমিক / ৪৯, চাইতে জানলে···অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / ৪৮, মাষ্টামশাই···শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় / ৫৬, বেচাকেনা···মৃণালকান্তি দাশ/৪১,
রঙিন চিত্রকাহিনী
সূর্য-সম্ভব ( সুভাগা পর্ব ) / ২-৩, ১৪-১৫, ৫০-৫১ ও ৬২-৬৩



সম্পাদকীয় দফতর : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট) কলকাতা ৭০০০৭২

# সূর্য্য-সম্ভব (সুভাগা পর্ব)

চিত্রকাহিনী : তাপস বিশ্বাস
চিত্ররূপ : ধীরেন

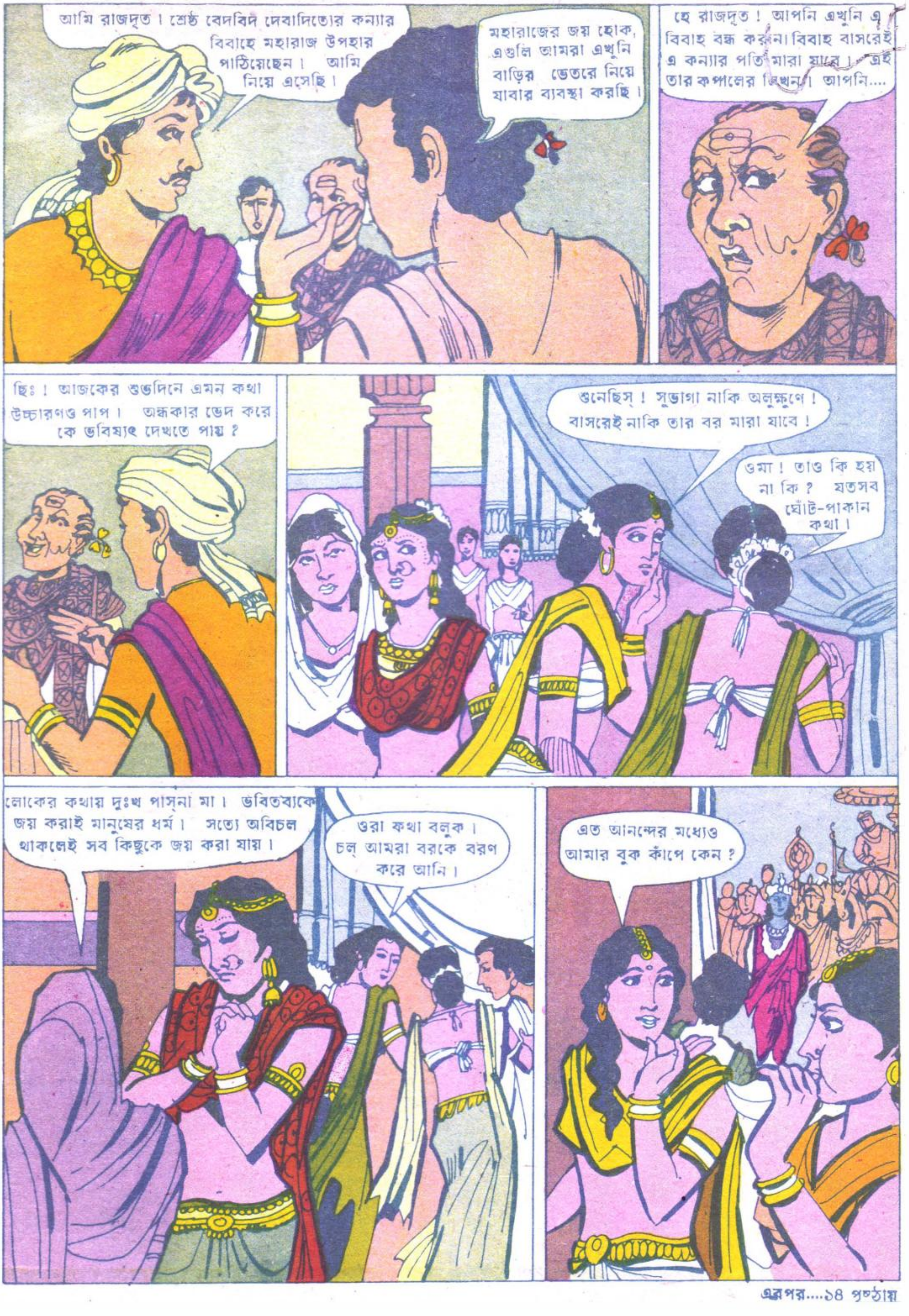

আমি রাজদূত। শ্রেষ্ঠ বেদবিদ দেবাদিত্যের কন্যার বিবাহে মহারাজ উপহার পাঠিয়েছেন। আমি নিয়ে এসেছি।
মহারাজের জয় হোক, এগুলি আমরা এখুনি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।
হে রাজদূত! আপনি এখুনি এ বিবাহ বন্ধ করুন। বিবাহ বাসরেই এ কন্যার পতি মারা যাবে। এই তার কপালের লিখন। আপনি....
ছিঃ! আজকের শুভদিনে এমন কথা উচ্চারণও পাপ। অন্ধকার ভেদ করে কে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়?
শুনেছিস্! সুভাগা নাকি অলুক্ষুণে! বাসরেই নাকি তার বর মারা যাবে!
ওমা! তাও কি হয় না কি? যতসব ঘোঁট-পাকান কথা।
লোকের কথায় দুঃখ পাস্না মা। ভবিতব্যকে জয় করাই মানুষের ধর্ম। সত্যে অবিচল থাকলেই সব কিছুকে জয় করা যায়।
ওরা কথা বলুক। চল্ আমরা বরকে বরণ করে আনি।
এত আনন্দের মধ্যেও আমার বুক কাঁপে কেন?


এরপর....১৪ পৃষ্ঠায়

কৈশোরের দুঃখ সুখের গল্প

# বাগাল বদনা

## অশোককুমার সেনগুপ্ত

বাগাল বদনা টের পায়, গেরস্ত তাকে ভারি ভালবাসে। গেরস্ত মালিক, কত্তা। বকাঝকা যে করে না, এমন কথা নয়। কিন্তু বাপ থাকলে কি তাকে বকত না, চড়চাপড় মারত না। বিল্টেকে ওর বাপ চ্যালা কাঠ ছুঁড়ে মেরেছিল। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত। ভাগ্যিস বাপ নাই বদনার। তবে গেরস্ত আছে। মা বলে, 'গেরস্ত বাপ-মা। উর মন যুগিন চলবি তাহালে আর ভাবনা নাই। এখুন গরুবাগালি করছিস ইর পর তুকে চাষ করতে জমি দিবেক। তুই হবি কিষাণ।'

তা সে সব ঢের দূরের কথা। সে গেরস্তর কাছ থেকে চাদরখানা পেয়ে এখন ভালবাসার স্বাদটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। নতুন চাদরের কি গন্ধ! আঃ নাক ডুবিয়ে কত টান মারছে, কিন্তু ফুরুচ্ছে না। বুক পেট ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। কি মিষ্টি গন্ধ! ফুলের চেয়ে ঢের সুঘ্রাণ। কোথায় লাগে গোলাপ চাঁপা। তারপর রঙ। টকটকে হলুদ। শুধু কি হলুদ! ফুলের কম কেরামতি। লাল সবুজ লতাপাতা। গায়ে জড়াতেই কেমন ওম পাচ্ছে সে। বেয়াড়া শীত পড়ে গেল। পৌষের গোড়াতেই আকাশ একদিন গোমড়ামুখো। পরদিন ঝিমঝিম বৃষ্টি। বৃষ্টির জোর না থাক কনকনে শীত একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বাতাস যে কোথা থেকে এত ঠাণ্ডা মেখে আসে! আর এমন ঝকঝকে

রোদ্দুর! শীতের ভয়ে তার যেন কত হেনস্থা! গায়ে লাগতেই চায় না সাহস করে।

তবে বদনা এখন আর শীতকে পরোয়া করে না। এখন অবশ্য চাদরটিকে পরিপাটি করে মুড়ে সে গাঁয়ের বাইরে আমবাগানের নিচু একটা আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। দু-একটা নেমে পড়েছে শূন্য ধানের ক্ষেতে। ঝকমকে রোদ উঠেছে। শীতের বেলা ঠাওর করা শক্ত। তবে বেলা হয়েছে। পেটেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। গেরস্ত ঘরে চা মুড়ি খাওয়ার পর এখন আবার কিছু চাইছে পেট। চাইলেই অবশ্য পাবে না। এক ফাঁকে ঝাঁ করে ঘর থেকে ঘুরে যে ভিজে ভাত খেয়ে আসবে তার উপায় নেই। কালকে সন্ধ্যের ভাতেই টান টান। মেজমামা এসে আচমকা হাজির। সকালেই অবশ্য গিয়েছে। তবে ধানের মরশুমে বদনা নিজের একটা তহবিল করেছে। আট টাকা সত্তর পয়সা হয়েছে। টাকাটা ভাঙবে না। সত্তর পয়সা থেকে দুটো লেড়ুয়া কিনতে পারত।

বদনা আমের ডালের দিকে তাকায়। দিব্যি আছে চাদরটা। চারপাশ বড় ফাঁকা। বিল্টে হরিশ, ধনারা গরু নিয়ে অন্যদিকে গিয়েছে। চাদরের জন্যে কাল বিল্টের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। মুখের কথা কাটাকাটি থেকে ঝাপটা-ঝাপটি। হরিশ ধনারা অবশ্য তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। তবে রাগ বদনার যায়নি। আসলে হিংসে বিল্টের। চাদরটা না হলে ধুলো হাতে নাড়ে। আর বলতে বলে কি না, 'কি আমার চাদর বটে, জলে ফেললেই ত কানি। রঙ চলে যাবেক।' এতে কার না রাগ হয়। নিজে তো একটা কালচে টেনা গায়ে দেয়।

বদনা বুঝতে পারছে হরিশ ধনারাও হিংসে করে। তার জন্যেই ওরা আজ ভিন্ন হয়েছে। তা ওদের গেরস্তরাও তো রয়েছে। ধনাকেও তো ওর গেরস্ত একটা চাদর দিয়েছে গত বছর। হিংসে করেছে বদনা? মোটেই না। অথচ—। আমবাগানে এসব ভাবনায় বদনার ভারি বিশ্রি লাগে। তারা সবাই মিলে এক জায়গাতে গরু চরায়। এক গাঁয়ের চার ঘরের বাগাল তারা।

কেউ বলে, বাগাল। কেউ বলে, মান্দের। সকালবেলাতে বাবুঘর বা গেরস্ত ঘরে হাজির হতে হয়। গোয়ালের বাইরে গরু বের করে গোয়াল পরিষ্কার করতে হয়। গরুকে খড় দিতে হয়। গেরস্তর টুকিটাকি কাজ থাকলে সেটাও সেরে দিতে হয়। এ সময় মেলে চা আর মুড়ি কিংবা একজোড়া রুটি। একটু পরে গরু খুলে চরাতে নিয়ে যেতে হয়। গেরস্ত ঘরে একবেলা ভাত মেলে। না নাও, ধান পাবে। রাতের জন্যেও ধান। ধরমপুজো আর দুর্গাপুজোতে প্যান্ট জামা। মাইনে নেই দশ বার বছরের ছেলেদের। তবে তের চৌদ্দতে মাসে দশ টাকা পাঁচ টাকা মাইনে গেরস্ত দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে টুকিটাকি গেরস্ত ঘরের কাজ অবশ্য করতে হবে।

তা বদনা মাইনে পায়। বার বছর বয়স। কিন্তু রোগাটে হলেও লম্বায় বড়সড় হয়ে উঠেছে। লম্বাটে মুখ, বড় বড় চোখ। গায়ের রঙ খদখদে কালো নয়, তার মধ্যেই একটু তামাটে ভাব আছে। মাথায় কোঁকড়ান চুল। পরিশ্রম করতে পারে। তবে রাগ একটু বেশি।

বদনারা জাতে বাগ্দী। ওর বাবা-মা আছে। বাপ হরি চাষ করে। নিজের জমি নয়। লাঙলও নয়। সবই গেরস্তর। মা পাটকুড়ুনি অর্থাৎ বাসনমাজা ঝি এক বাড়ির। বদনারা পাঁচ ভাইবোন। বদনাই বড়। তারপর তিন বোন। তারপর ভাই।

তা গেরস্ত চাদর দেওয়ার পর বদনার ঝামেলা বেড়েছে। মা বলল, 'ভাইকে একটুস গায়ে দিতে দে। কাঁদছেক ছেলেট চাদরের লেগে।'

ছোট ছেলে। ময়লা করবে না। বদনার গেরস্তঘর যাওয়া মাথার উপর রইল। হেই হেই করে কেবল ভাইকে, 'দিলি ত ধুলো লাগিন।' 'আহা, জল লাগবেক', 'নাক মুছিস না চাদরে', 'দেখ দেখিন পা দিয়ে দলছিস।'

দেখেশুনে মা বলল, 'বাবা বাবা তুর চাদর লিয়ে লে।'

বদনা ওমনি নিয়ে নিল। দশ বছরের বোনকে একবার দেওয়ার পর সেই এক অবস্থা। তা বোন বলল, 'দাদা তুর চাদরে আমার কাজ নাই।'

বদনা লজ্জা পেয়ে বলল, 'আহা তা কেনে— গায়ে দে।'

'না। তু এমুন করিস যেন কখুনও ময়লা হবে নাই।'

বাড়ির লোক আর কেউ নিতে আগ্রহ দেখায় না। ভাইবোনেরা জ্বলজ্বল চোখে তাকায়। তা বলে বদনা নষ্ট করতে দিতে পারবে না। বদনা ছোটছেলে হলেও বোঝে বৈকি, ভাইবোনেদের সকলেরই চাদরের দরকার। মা বাবা কার নয়। কিন্তু টাকা কোথায়! এখন পৌষ মাস, তাই দু'বেলা ভাত জুটছে। নইলে একবেলা আহার। ধর্মরাজপুজো ছাড়া নতুন জামা-কাপড় হয় না। তবে বাবুঘর থেকে পুরনো জামা-প্যান্ট ভিক্ষে জোটে। ভাইবোনেরা মায়ের টেনা, বাবার লুঙ্গি ছেঁড়া গায়ে দেয়। বদনা পারলে সবার জন্যে একটা করে চাদর কিনে দিত। কিন্তু কোথায় টাকা পাবে!

বদনা আশপাশ দেখে। আমবাগানের ওদিকে একটা উঁচু পাড় পুকুর। কাঁধে চাবজাল নিয়ে পাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে ভবাদা। শূন্য ধানের ক্ষেতে কটা গোলাপায়রা নেমেছে। এখনও শীষ থেকে পড়ে যাওয়া ধান মাটিতে পড়ে আছে। না, নষ্ট কিছু যায় না। পাখপাখালিকে তো খেতে হবে। ঝকঝকে রোদ একটু যেন তেজালো মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া অবশ্য তেজটা ধরে রাখতে দিচ্ছে না। বন্ধুরা অন্য জায়গায় গরু নিয়ে যাওয়ায় তার রাগ গিয়ে এখন দুঃখ হচ্ছে। একা একা কার ভাল লাগে! অথচ চাদরের জন্যে—।

কানু জ্যাঠা চাদরটা হাতে নিয়ে টেনে-টুনে পরখ করে বলল, 'মুনে হচ্ছে জিনিসট মুন্দ লয়। তেবে কদিন আর রাখবি।'

কানু জ্যাঠা শুধু নয়, পাড়ার কম হাত আর কম চোখ চাদরটা দেখল! গর্বে তো বদনার বুক সাত হাত। সেই কবে যেন বাবা একটা চাদর কিনে দিয়েছিল, মনেও পড়ে না। কতকাল পরে নতুন চাদর পেল সে। ওটার যত্ন করতে গেলে একটু বিবাদ তো হবেই। তা বলে বদনা মোটেই বাগাল বন্ধুদের কাছে যাবে না। গিয়ে বলবে না, আহা রাগ করেছিস তুরা? সে পাত্র সে নয়। বরঞ্চ ওরাই আসবে। মারামারিতে কেউ পারে না তাকে। গাছে চড়াতেও না। তারপর সামনেই আসছে মইষেবুড়ী বনে মেলা। পয়লা মাঘ পুজো। দোকানপাট হৈ হল্লা। বদনা না গেলে কে নিয়ে যাবে ওদের। গুম হয়ে বসে থাকল বদনা।

কিন্তু চাদরটা নিয়ে শেষমেস যে গেরস্তর তারই সমবয়সী ছেলে অপুর সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, তা বদনার ধারণাতে ছিল না। কদিন পরে গরু চরাতে এসে সেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। পৌষে ছেলেরা সব 'পৌষাল্লা' করতে আসে। শহরে শীতের পিকনিকের মত বীরভূমের এই অঞ্চলে 'পৌষাল্লা'র জোর রেওয়াজ। মাঠে গিয়ে রান্না। অবশ্যই খিচুড়ি আর ডিমের তরকারি। মাছ মাংস হতে পারে। তবে খিচুড়ি চাই-ই। বিভিন্ন পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এটা করে থাকে। গেরস্তদের ছেলেরাই সব। অপুর দলও এসেছিল। তারপর গাঁ ছাড়িয়ে ধানক্ষেত ডিঙিয়ে বুনো ডোবা নামে একটা ডোবার ধারে আয়োজন করেছিল। গরু চরাতে চরাতে বদনা গিয়ে হাজির সেখানে। একটু দূরে দাঁড়িয়েই সে দেখছিল, গেরস্ত ঘরের বাবু বাবু ছেলেদের উনুন ধরাতে হাস্তসাস্ত হওয়া, হৈ হল্লা করা, জল বয়ে আনা, তরকারি কোটা। তার মধ্যে এক-সময় বদনার কাছে এগিয়ে এল অপু। বয়সে তার চেয়ে সামান্য ছোট হবে। গোলগাল ফরসা চেহারা, গলা পর্যন্ত ঢাকা ফুলহাতা টকটকে লাল সোয়েটার, নীলচে প্যান্ট।

অপু চাদরটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে তো বদনা ওটা?'

—'কেনে?'

—'পেতে বসব ঘাসের উপর। লুডো খেলব।'

অপু একা নয়। পাড়ার ছেলেদের সকলেই চেনা। শঙ্কর, সোনা, বুবাই। তবে ওরা সব নীরব। অপুদেরই না সে বাগাল। সেই জোরেই ও চাইছে।

বদনা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচে জবাব দিল, 'ইস পেতে বসব। কি আমার সখ বটেক রে।' —বলে কাঁধের উপর জড়ো করা চাদরটাকে সে খামচে ধরল।

—'দে দে, ওটা তো আমরাই দিয়েছি?'

—'এমনি এমনি নাকি? আমি গরু চরাই না?'

—'বলছি দিতে—।'

—'দুব না।'

—'খুব গরম হয়েছে তোর। আমরাই দিয়েছি আর আমাকেই দেব না বলছিস। —অপু এগিয়ে এল কেড়ে নিতে। কিন্তু হাত ছোঁয়ানর চেষ্টা করতেই বদনা একটা ঠেলা দিল। আর

অপু বোধকরি আশা করেনি দৈহিক এমন বাধা আসবে। ফলে অপ্রস্তুত ছিল সে। ধাক্কাটা সামলে নিতে পারল না। ঝটিতি সে উঠে পড়ে। তারপর ঘুষি পাকিয়ে ছুটে এল বদনার দিকে। দ্রুত হাতে বদনা ধরল হাত মচকে দিয়ে আবার একটা ঠেলা দিল। এবার পড়ল না অপু। তবে হাতের ব্যথায় ককিয়ে উঠে আরও হিংস্রভাবে সে এগিয়ে এল।

বদনা এবার চাদর ফেলে রুখে দাঁড়াল, 'তবে রে---।'

থমকে গেল অপু।

—'আমি ছাড়ব নাই, হুঁ, গিরস্তর ছেলে হও আর যে হও। তুমরা সাক্ষী—উ আগে আমাকে মারতে এসেছে—।'

কথা শেষ করতে দিল না অপু। ঝাঁপিয়ে পড়ল বদনার ওপর। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আর্তনাদ তুলে চলল কেবল।

সকলেই এসে জুটেছে। কিন্তু বদনার দিকে কেউ এগুতে পারল না। বদনা দেখল, অপু ঘরের দিকে হাঁটছে। সেও অন্য পথ ধরল চাদরটা কাঁধে ফেলে। কিছুটা হাঁটার পর সে অনুভব করল, কাজটা সাংঘাতিক হয়েছে। গেরস্তর ছেলেকে কিছু বলা অতি গর্হিত। পেট ওখানেই বাঁধা। কিন্তু চাদরটাকে তা বলে তো সে আর মাটিতে বিছিয়ে দিতে পারে না। অপু বাড়িতে সাত কাণ্ড করে লাগাবে। ভাল মানুষ গেরস্তও রুদ্রমূর্তি ধরবে।

এতক্ষণে বদনার ভয় আসে। নিজের সে কোন অন্যায় খুঁজে পায় না। অথচ অপরাধী। ভাবনাটাও তাকে ছাড়ে না। হু, বাবুদের ছেলে বলেই! তা বাবুদের ছেলে বলে অপুর অন্যায়টা ন্যায় হবে? সেও অপুর মত নয়? হ্যাঁ, তার বাবা গরীব, কুঁড়েতে থাকে, দু'বেলা ভাত দিতে পারে না। সে নিজে গোলগাল নয়। স্কুলে যায় না। কিন্তু মানুষ তো সেও। চাদরটা তো গেরস্ত এমনি এমনি দান করেনি। সে বাগাল। গরু চরায়। চাদরটা তার সেই শ্রমেরই অর্জিত। এতে তার সম্পূর্ণ অধিকার।

বদনার এরকম এলোপাথাড়ি ভাবনার মধ্যে বেলা পড়ে আসে। রোদের রঙ লালচে হয়ে আসে। গরুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে আছে। উঠে সে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে। অনেকটা দূরে পোষাল্লার জায়গাটা দেখে। পুকুরের পাড় আড়াল করে রেখেছে। কে জানে, ওরা এখনও আছে কি না।

বদনা ভাবে, সে গেরস্ত ঘরে মুখ দেখাবে কেমন করে? শুধু তো গেরস্ত ঘর নয়, বাপও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। মাও না। তাহলে এখন কি করে। রোদের ঝিমুনি ভাব নামছে। এবার ঘরে ফেরার সময়। গোয়ালে গরু বাঁধতে হবে। তার মানেই গেরস্তর মুখোমুখি।

গরুগুলোকে পাশাপাশি করে গাঁয়ে ঢোকার মুখে লালুকাকাকে আগে আগে হাঁটতে দেখে তার মাথায় ঝাঁ করে একটা বুদ্ধি এসে গেল। ছুটে গিয়ে সে ধরে ফেলল। লালুকাকা গেরস্ত ঘরের কিষাণ। তাকে ভালবাসে। সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অ কাকা, গুয়ালে আমার গরুগলাতে বেঁধে দিবে?'

—'কেনে, তু যাবি না?'

—'না।'

—'কেনে?'

ঢোঁক গিলে বদনা বলল, 'একট দু টাকার লোট হারিনছি, খুঁজতে যেছি।'

—'খুঁজ। খুঁজ। বলি, দু দুটো টাকা! আঁ লিয়ে গেইছিলিস কেনে? বলি, সাত হাত মাটি খুঁড়লে একট পয়সা হয় না।'

বদনা পিছন ফিরে আবার ছুট। লালুকাকার কাছে মিথ্যে কথা বলতে হল। বদনা মিথ্যে কথা বলে না। কি করবে! মনে মনে বলল, হে মা কালী, আর কখুনও বলব না। ইবারের পারা আমার দুষ লিও না। পাপ লিও না। গেরস্তঘর যেতে ডর লাগছে যে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে। শীতের দিন ডানা মুড়ে বসে পড়ছে মাটিতে। হিম হিম হাওয়া বইছে। চাদরটাকে সে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এর পর সন্ধ্যা আঁচল বিছিয়ে বসে পড়বে। অন্ধকার হয়ে আসবে। আকাশে তারা ফুটবে। সারা গাঁ ঘুমিয়ে পড়বে। গাঁয়ের বাইরে ফাঁকা ডাঙায় তো থাকা যায় না। খিদেও তো পাচ্ছে।

গেরস্তপাড়ার দিকে না গিয়ে গাঁয়ের পশ্চিম-দিক ধরে বদনা কুমোরপাড়ায় ঢুকল। আকাশে তারা ফুটেছে। অন্ধকার করে সন্ধ্যা নামছে। বাঁশবাগানে পাখিরা সব তুমুল কিচিরমিচির লাগিয়েছে। কোথায় যাবে? এমন সময় বদনার কানে গেল কান্নার শব্দ। তার টের পেতে দেরি হল না, এ কান্না কুমোরবুড়ির। সংসারে কেউ নেই। বয়সেরও গাছপাথর নেই। ধবধবে সাদা মাথার চুল। কুঁজো হয়ে হাঁটে। গায়ে চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। ভিক্ষে করে খায়। কান্নার শব্দের সঙ্গে কাঁপুনি মিশে কেমন যেন অদ্ভুত গোঙানির মত শোনাচ্ছে। মানুষ নয় যেন একটা আহত জন্তু।

বদনা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। দরজার কপাট নেই। ভেতরে একটা লম্ফ জ্বলছে। ছেঁড়া চাটাইয়ে একটুকরো কাপড় পরে বুড়ি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে।

—'অ কুমোরবুড়ী? কি হল তুমার?'

'জাড় বেটা। বাডা জাড়।'—কাঁপা গলাতে বুড়ী বলে।

—'তা একডুং আগুন করলে পারতে।'

বদনা আর দাঁড়াল না। বাইরে বেরিয়ে এল। পাশেই খামার বাড়ি। খড়ের স্তুপ। দু' আঁটি খড় নিয়ে এল। তারপর মুঠো করে নিয়ে লম্ফে ধরিয়ে বুড়ীর সামনে রাখল। কিছুক্ষণেই যেন শীত কিছুটা কাটাতে পারল বুড়ী। তবে দু' আঁটি খড়ের আয়ু কতক্ষণ?

—'কৈথাটে'থা নাই?'

—'না বাপ, ঘর থেকেন কে লিয়ে পালিনছে।'

—'জাড়ে যে মরে যাবে।'

বুড়ী সাড়া করে না। চোখ তুলে বদনার চাদরটা খড়ের আলোয় দেখে। আর বদনা তখনই চাদরটা আঁকড়ে ধরে। তারপর বুড়ী চোখ নামিয়ে নিতে হাত কেমন যেন শিথিল হয়ে যায় তার।

—'কুমোরবুড়ী, অ কুমোরবুড়ী।'

—'কি বাপধন?'

—'তুমার কেউ নাই?'

—'না।'

—'তুমার ঢেক কষ্ট বল।'

—'হুঁ।'

—'তুমি আমার চাদরট লাও—ঢাকা লিয়ে বস।'

—'না, বাপধন, সোনামনা, আমার লাগবেক নাই।'

আপত্তি শুনে বদনার দেবার আগ্রহ আরও বাড়ে। চাদরটা খুলে বাড়িয়ে দেয়, লাও।

বুড়ী হাত বাড়ায় না। বলে, 'তুকে বকবেক ঘরে।'

'বারে, ই ত আমার চাদর, আমি বাগালি করি, খাটি, ই আমার খাটনির পাওনা। আমি ইট লিয়ে যা খুশি করতে পারি। লাও—তুমি শীতে ঢেক কষ্ট পেছ।'—বলে বদনা বুড়ীর গায়ের ওপর চাদরটা ফেলে দেয়। তারপর বেরিয়ে আসার আগে বলে, 'ভাল করে জড়িন বস। তাহালে আর জাড় লাগবেক নাই।'

ঘরে পা দিতেই বাপ বলে, 'গেরস্ত ঘর থেকে লুক এসেছিল। গরু ছেড়ে চলে এসেছিস। বাঁধতে যাস নাই। উনের ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?'

—'করব না।' বদনা বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, 'উ চাদরট পেতে বসব বলছিল?'

—'বলছিল নাকি?'

—'হুঁ। তা বাদে আগে উ মারতে এসেছে। সবাই সাক্ষী আছে। কত সখ, উকে আমি চাদরট পাততে দুব। ধুলো মাটি লাগাতে দুব।'—বাবার রাগ মেজাজ না দেখতে পেয়েই বুঝি এতক্ষণে বদনার প্রবল অভিমান নামে। বলে, 'বলে কি না আমরা দিয়েছি। গরুবাগালি করি, দান করে নাই?'

'বটেই ত।' —মা জোর দেয় ছেলের কথা, 'উ বাবু চাদর নষ্ট হতে দিবেক কেনে! কিন্তুক চাদরট তুর কুথা?'

বদনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না।

বাপ বলে, 'এই বদনা, কুথা চাদর?'

—'কুমোর বুড়ীকে দিয়েছি।'

—'ছ্যাঃ ছ্যাঃ। গেরস্তর ছেলের সঙ্গে যার লেগে লিঠা, তু তাই করে এলি। বুড়ী যি বাডা ময়লা মেখে থাকে। উ যি একরেতেই তুর—।'

—'জানি বাবা!'

মা বলে, 'জানিস তাহালে দিলি কেনে?'

বাগাল বদনা ধরা গলায় শুধু বলতে পারে, 'উর যি বাডা জাড় লাগছিল মা। থরথর করে কাঁপছিল।'

বাগাল বদনা দেখে মা-বাবার গলা দিয়ে একটা স্বরও নিঃসারিত হচ্ছে না।

ছবি : জি সান্তা

বিজ্ঞানের চোখে ইতিকথা

# সাহারার অতীত প্রাণী

## সমরজিৎ কর

সাহারা! পৃথিবীর বৃহত্তম এই মরুভূমি এখন যেন বড় রকমের একটি আতঙ্ক। লিবিয়ার উত্তর-পূর্বে ঠিক ভূমধ্যসাগরের উপকূলের উপর দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি শহর। নাম বেনগাজী। হ্যাঁ, সেখান থেকে সরাসরি পঁচাত্তর কিলোমিটারের মত দক্ষিণে এগিয়ে গেলে পড়বে ছোট্ট একটি নাম 'কাসর অজ সাহাবি'। দূরত্ব তো মাত্র পঁচাত্তর কিলোমিটার। কিন্তু ওই সামান্য দূরত্বেই প্রকৃতির চেহারাটা যে কতটা পাল্টাতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। বেনগাজী যেন স্বর্গ। চারদিকে গাছপালা, ঘরবাড়ি। জলহাওয়াও কত স্নিগ্ধ। আর কাসর অজ সাহাবি? একটা আস্ত রাক্ষস। সাহারা মরুভূমির এই গ্রামে এতটুকু যেন প্রাণের স্পর্শ নেই। চারদিকে ধূ ধূ বালি, মাঝে মাঝে বালির পাহাড়। ঝড় উঠল তো প্রাণ রাখা দায়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সেখানে অগ্নিকুণ্ড। রাতে হাড় কাঁপানো শীত। সবুজ গাছপালা? তার কোন চিহ্ন নেই বললেই চলে। প্রাণী বলতে রক্তচোষা মাছি, সাপ আর ইঁদুর। প্রকৃতির সেই রাক্ষসী রূপ দেখলে বুক হু হু করে কাঁপে।

কিন্তু কি বলব, আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে এখানকার চেহারাটাই ছিল অন্য রকম। তখন এখানে ছিল বিস্তৃত তৃণভূমি, গভীর বন। ছিল প্রাণবন্ত নদী, জলা, খালবিল। নদীগুলির সঙ্গে ছিল ভূমধ্যসাগরের যোগ। তাই নদীগুলিতে চলত জোয়ার-ভাঁটা। আর কতরকম প্রাণীই না বাস করত সেখানে। জলে এবং ডাঙায়। বাস করত পাখি, সরীসৃপ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ। স্তন্যপায়ী প্রাণীও বাস করত। এখন তারা অবলুপ্ত।

মজার ব্যাপার এই, এত বড় একটি ঘটনা আগে কেউ জানতেই পারেনি। খবরটা প্রথম জানা গেল ১৯২০-র দশকে। বলতে কি সেও এক নাটকীয় ব্যাপার! সাহাবিতে রয়েছে একটি প্রাচীন দুর্গ। সেও 'বাইজানটাইন' সভ্যতার আমলের। দুর্গটির নাম কাসর অজ সাহাবি। 'কাসর' শব্দটি এসেছে লাতিন 'কাসট্রম' শব্দটি থেকে। যার মানে 'দুর্গ'। একদল দখলদার ইটালীয় সৈন্য ওই সময় ওই দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর তারপর তার আশপাশে তাঁবুর খুঁটি পুঁততে গিয়ে— হায় ভগবান! —এ যে রীতিমত এক রহস্য? বালির স্তরের নিচে পাওয়া গেল অদ্ভুত সব প্রাণীর জীবাশ্ম।

সেটা ১৯৩৪। সেনাবাহিনীর প্রধান খবরটা পাঠালেন বিশিষ্ট ইটালীয় ভূ-তাত্ত্বিক আরদিতো দোসিও-র কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এক ছাত্র কার্লো পেত্রোকচিকে পাঠালেন সাহাবিতে পাওয়া জীবাশ্মগুলিকে পরীক্ষা করতে। কার্লো এসে সব খুঁটিয়ে দেখলেন, কতরকম প্রাণীরই না জীবাশ্ম! আর কি বিরাট তাদের আয়তন! এদের মধ্যে উল্লেখ করার মত চার দাঁত বিশিষ্ট এক ধরনের হাতীর জীবাশ্ম। যা বহুকাল আগেই পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। ইংরেজিতে এই হাতীকে বলা হয় 'ম্যাস-টোডন'। বৈজ্ঞানিক নাম স্টেগোটেট্রাবে-লোডন লিবিকাস। ১৯৭৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ভিনসেন্ট ম্যাগলিও এই জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানালেন, বিচিত্র এই হাতীর বয়স কম করেও ষাট লক্ষ বছর। অর্থাৎ আজ থেকে ষাট লক্ষ বছর আগে ওই প্রাণী লিবিয়ার ওই অঞ্চলে বাস করত।

১৯৭৮ সালে সাহাবিতে খনন চালিয়ে পাওয়া গেছে আরো নানান প্রাণীর জীবাশ্ম। যেমন ধর, কৃষ্ণসার মৃগের জীবাশ্ম। আফ্রিকায় এখন ডিক-ডিক নামে যে ধরনের কৃষ্ণসার হরিণ দেখা যায়, তাদের চেহারাটা ছিল কতকটা সেই রকমই। কিছু কিছু বানরজাতীয় প্রাণীর জীবাশ্মও পেয়েছেন তাঁরা। যারা সম্ভবত এখনকার 'ম্যাকাকা' প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া আর এক ধরনের বানরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যাদের বলা হয় 'লাইবিপিথেকাস'। এসব দেখে-শুনে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন, হয়ত এই অঞ্চলে আরো উন্নত শ্রেণীর বানরও বাস করত। হয়ত বাস করত মানুষের পূর্বপুরুষ কোন প্রাণী 'অস্ট্রেলোপিথেকাস'। এরাই প্রথম মানুষের মত দুই পায়ে ভর করে চলাফেরা করতে শুরু করে। উদ্ভিদ-জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে, সাহাবির এই অঞ্চলে তখন ছিল অজস্র জলা, নদী এবং ফাঁড়ি। ছিল ঝোপঝাড়, সাভানাভূমি। যেখানে জন্মাত লম্বা লম্বা ঘাস এবং বাবলাজাতীয় গাছপালা। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে মিওসিন এবং প্লিওসিন যুগের মাঝামাঝি সময়ে আফ্রিকা এবং ইউরেশিয়ার মধ্যে নানা রকম প্রাণীর যাতায়াত ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। ১৯৭৮ সালে সাহাবিতে পাওয়া গেল 'ইনডারকটস' প্রজাতির এক ধরনের শুয়োরের দাঁতের জীবাশ্ম। এ ধরনের শুয়োরের জীবাশ্ম ইউরেশিয়াতে প্রচুর পাওয়া গিয়েছিল। এবারকার আবিষ্কার প্রমাণ করল, বিজ্ঞানীরা যা অনুমান করেছিলেন সেটা মিথ্যে নয়। সত্যিই যে ইউরেশিয়ার প্রাণী আফ্রিকাতেও এসেছিল এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আশ্চর্যই হতে হয়। সাহাবির বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে সিন্ধুঘোটক জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম। তবে তারা আকারে ছিল এখনকার সিন্ধুঘোটক থেকে কিছুটা ছোট। যে কালে এখানে তারা বাস করত, সে সময় ভূমধ্যসাগর গিয়েছিল শুকিয়ে। ফলে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে তার আর কোন যোগ ছিল না। তখন ভূমধ্যসাগরের বুকে জমে থাকত শুধু পুরু লবণের স্তর।

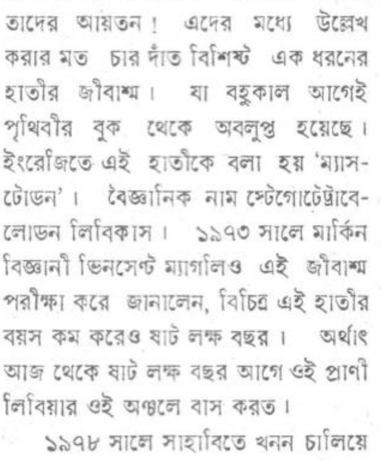

ষাট লক্ষ বছর আগে সাহাবির মরু অঞ্চলে বাস করত চার দাঁতের হাতী

সাহাবিতে এইভাবেই হয়ত একসময় বিচরণ করত আগ্রাসী হাঙর

মাঝে মাঝে কয়েকটি হ্রদও ছিল। তবে সেইসব হ্রদে যে জল ছিল তা অনেক বেশি লবণাক্ত ছিল। অতিরিক্ত এই লবণ-জলে বাস করার দরুণই হয়ত তখনকার সিন্ধুঘোটকগুলির চেহারা হয়েছিল অমন ছোট। পাওয়া গেছে জলহস্তীর মত প্রাণীরও জীবাশ্ম। কিছুকাল আগে এখনকার জলহস্তীরও জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে অদ্ভুত চেহারার সব জিরাফ, ঘোড়া এবং বিভিন্ন জাতের হরিণের জীবাশ্ম।

সাহাবির সেই দুর্গের কিছু দূরে বছর দুই আগে কিছু কিছু হাড়গোড়ের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। মাটি এবং পাথরের নিচে পড়ে সেই সব হাড়গোড় পাথরে পরিণত-প্রায়—অর্থাৎ এখন জীবাশ্ম। অবাক কাণ্ড। এ তো ঠিক চারপেয়ে প্রাণীর হাড়গোড় বলে মনে হচ্ছে না? ডারউইন বলেছিলেন, পৃথিবীর বুকে প্রথম জন্মেছিল এমন এক ধরনের প্রাণী—যার দেহ বলতে ছিল একটি-মাত্র জীবকোষ। ক্রমে পৃথিবীর বয়স বাড়তে লাগল। আর সেই এককোষী জীব থেকেই ধাপে ধাপে জন্ম নিল কত রকমের উদ্ভিদ। কত রকম প্রাণী। কোটি কোটি বছর পর জন্ম নিল মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ। মাছের পর সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। তারা জলেও বাস করত। আবার ডাঙায় বিচরণ করত। কি বিরাট তাদের চেহারা। জন্ম নিল পাখি। তাদের কারোর চেহারা ছিল এখনকার শকুনীর মত। কারোর ধনেস পাখির মত। তাদের ডানা পনের কুড়ি ফুট লম্বা। ক্রমে এল বানর জাতীয় প্রাণী। প্রকৃতির জলহাওয়া পালটাল। মাঝে মাঝে বিপর্যয়। এ সব সহ্য করতে না পেরে পৃথিবীর বুক থেকে কত প্রাণী অবলুপ্ত হল। যারা বেঁচে রইল, তাদের চেহারা এবং আচরণে এল পরিবর্তন। বানররা চেহারা পালটাতে লাগল। তাদের কারোর কারোর লেজ হতে লাগল ছোট। ক্রমে লেজই আর রইলো না। তারপর এক সময়, সেও লক্ষ লক্ষ বছর আগে জন্ম নিল মানুষের মত প্রাণী। কিন্তু মুশকিল হল, সেই মানুষের মত প্রাণীর কোন অস্তিত্বই বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাননি। সাহাবির ওই হাড়গোড় দেখে এবার যেন আশার আলো দেখলেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা তাদের খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। জীবাশ্মগুলির মধ্যে ছিল বাহু এবং কাঁধের হাড়। অন্তত সেই বাহু। তাঁদের মনে হয়, যাদের এই বাহু, তারা মাথার উপর হাত তুলে কাজ করতে পারত। যেমন আমরা পারি। এক খণ্ড পায়ের হাড়ও পাওয়া গেছে। এই হাড় ঠিক মানুষের পায়ের গোড়ালির মত। মাথার একটি খুলিও পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। এই খুলির আয়তন এখনকার শিম্পাঞ্জীদের মাথার খুলির মত। তবে আয়তনে ছোট। এইসব হাড়গোড় এবং খুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে এই হাড়গোড় এবং খুলি সম্ভবত মানুষ এবং বানর জাতীয় কোন জীবের মাঝামাঝি জীবের। ওরাই হয়ত ছিল মানুষের ঠিক আগের পর্যায়ের প্রাণী। জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে ওরাই শেষ পর্যন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে।

সেই প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে, সেখানে যে হায়েনাও বাস করত, তারও প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল যে প্রাণী, তাদের মৃতদেহ হয়ত সেই হায়েনারাই খেয়ে ফেলে। পরিবর্তে পড়ে থাকে তাদের হাড়গোড়। তাই পূর্ণাঙ্গ কোন প্রাক-মানুষ-প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আবার কেউ কেউ এখনো ভাবছেন, ওই সব প্রাক-মানুষ-প্রাণী বাস করত গভীর জঙ্গলে। সেখানকার মাটি ছিল অম্ল। সেই অম্ল মাটিই তাদের মৃতদেহগুলি বিকৃত করে। এর জন্যেই তাদের দেহের জীবাশ্ম পুরোপুরি অবস্থায় পাওয়া যায়নি। অথবা এমনো হতে পারে, ওই সব প্রাক-মানুষ জোয়ার-ভাঁটা খেলে এমন ধরনের নদী নালা থেকে দূরে বাস করত। লবণাক্ত হ্রদ এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলেও তাদের যাতায়াত ছিল কম। বরং ঘন বনগুলিকেই তারা তাদের আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। নদীর ধার তারা এড়িয়ে চলল। সাভানার পরিবেশই ছিল তাদের কাছে প্রিয়। সে সব অঞ্চলে খনন চালালে হয়ত তাদের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, সাহাবির রুক্ষ পরিবেশে তখন ছিল প্রাণের জোয়ার। নদী মোহনায় বাস করত নানা রকম মাছ। দানবাকার হিংস্র হাঙর। লেগুন এবং নদীর জলে বিচরণ করত সিন্ধুঘোটক। মাঝে মাঝে তাদের আক্রমণ করত হাঙর। ঘাসের ঝোপে বাস করত বিচিত্র কীটপতঙ্গ, পাখি এবং সরীসৃপ। সেই পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে।

তারপর এল ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন। শুকনো ভূমধ্যসাগর ভরে উঠল জলে। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে আবার যুক্ত হল। যে সব প্রাণী এতকাল অতিরিক্ত লবণাক্ত জলে বাস করত, ভূমধ্যসাগরের জলে লবণের মাত্রা কমে যাওয়ায় তারা পড়ল বিপদে। সেই জলে বাস করার মত ক্ষমতা হারিয়ে অনেকেই হল অবলুপ্ত। অনেকে মারা গেল। কিছু কিছু প্রাণীর মধ্যে ঘটল জৈবিক বিবর্তন। তারা বেঁচে রইল পরিবর্তিত কলেবর নিয়ে।

সেইসঙ্গে ওই অঞ্চলের আবহাওয়াও গেল পাল্টে। আকাশে মেঘ নেই। নেই বৃষ্টি। নদীনালা হ্রদ সব শুকিয়ে গেল। জলের অভাবে গাছপালা কমতে লাগল। অবশেষে জমতে লাগল বালি। মরুভূমি গ্রাস করল এত দিনের শ্যামল পরিবেশ। প্রাণচঞ্চল সাহাবি চাপা পড়ল মরুভূমির নিচে। মরু-সাহারা। এখন সেখানে গেলে কে বলবে, সেখানে ছিল প্রাণের জোয়ার? পরিবেশের পরিবর্তন জীব-জগতের যে কত ক্ষতি করতে পারে সাহাবিই তার প্রমাণ! □

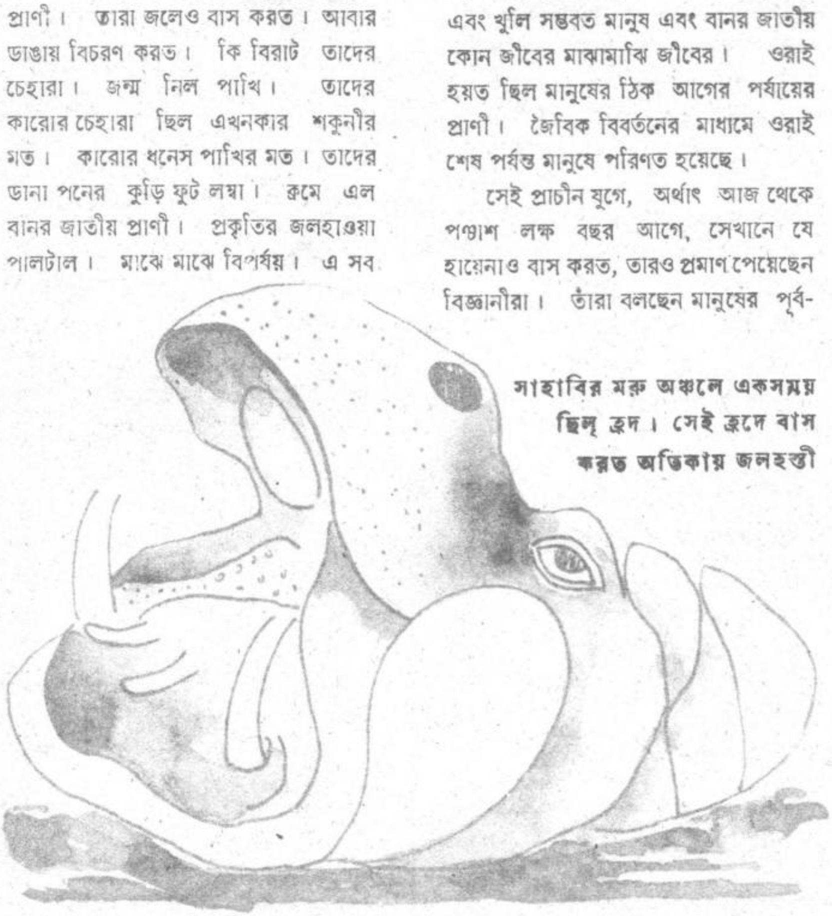

**সাহাবির মরু অঞ্চলে একসময় ছিল হ্রদ। সেই হ্রদে বাস করত অতিকায় জলহস্তী**

# কলকাতার প্রথম ডাকঘর

সুভাষ সমাজদার

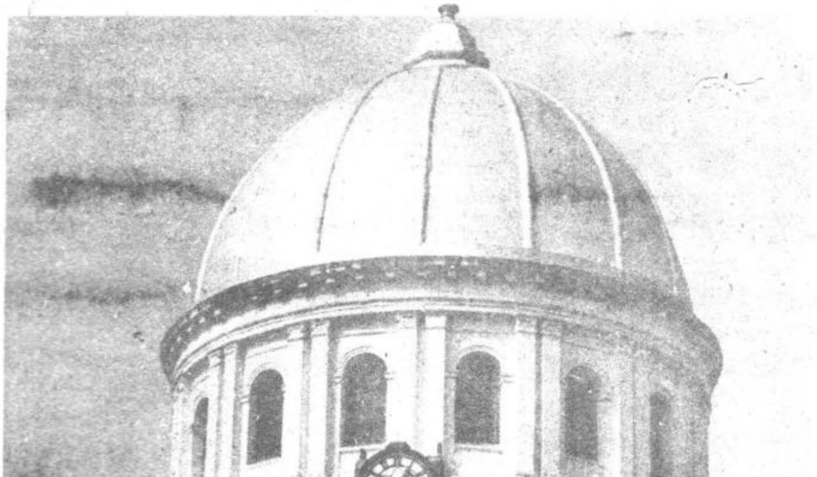


চিঠি আছে—চিঠি !

স্তব্ধ দুপুরে ডাকপিওনের গলা শোনা যায়। ছুটে যায় বাড়ির মেয়েরা। কে জানে কোথা থেকে এসেছে কোন প্রিয়জনের চিঠি। চিঠি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়—কে আগে পড়বে—এই দৃশ্যটি তোমাদের খুব পরিচিত অনেক দেখেছ তোমরা।

আবার অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়িতে কি বড় বড় অফিসবাড়ির নিচতলায় সারি সারি বাক্সে লেখা থাকে—লেটার বক্স। পিওন এসে নিঃশব্দে বিভিন্ন লোকের কি কোম্পানির নাম লেখা বাক্সে তার তার চিঠিগুলো রেখে চলে যায়। ডাক হাঁকের কোন হাঙ্গামা নেই। ধীরেসুস্থে বাড়ির বিভিন্ন বাসিন্দারা কিংবা কোম্পানির বেয়ারারা এসে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে তাদের চিঠি বের করে নিয়ে চলে যায়।

কত সুন্দর—কী সুশৃঙ্খল ডাকবিলির ব্যবস্থা। পোস্টকার্ড কি খাম কিনে কিংবা সাদা খাম কিনে তাতে স্ট্যাম্প অর্থাৎ ডাকটিকিট লাগিয়ে ডাক বাক্সে ফেলে দাও। হাওয়াই জাহাজে কি মেল ট্রেনে চলে যাবে তোমার চিঠি দেশের দূরতম প্রান্তে। শুধু দেশের ভেতরেই নয়। আমেরিকা এবং ইউরোপের প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ডাকটিকিট আছে—সেই টিকিট কিনে চিঠিতে সেঁটে পাঠিয়ে দাও—সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারের দূর বিদেশে চলে যাবে তোমার চিঠি।

কিন্তু কখনো কি ভেবেছ তোমরা এই শহর কলকাতায় কবে প্রথম ডাকবিলির ব্যবস্থা হয়েছিল, আর কত বিবর্তনের ভেতর দিয়ে, কত বাধার চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে এসেছিল এই সুশৃঙ্খল পোস্টাল সিস্টেম আর এই শহরের প্রথম পোস্ট অফিসই বা কোনটি?

দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের জন্য আকুলতা ছিল সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে। প্রাগৈতিহাসিক কালে গুহাবাসী আমাদেরই অতীত পুরুষরা আগুন জ্বালিয়ে সংকেত দিত দূরের মানুষকে। কখনও বা আবার হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য কি দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে পায়ে হেঁটে খবরাখবর করত। তার অনেক—অনেক পরে রাজরাজড়ারা তাদের সীমানার ভেতরে চিঠিপত্র পাঠাত বেতনভুক ঘোড়ায় চড়া কিংবা পায়ে চলা পত্রবাহক মারফৎ। কিন্তু তাতে অবশ্য কেউ তার নিজস্ব চিঠি পাঠাতে পারত না।

প্রায় সাড়ে ছশো বছর আগে বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনে বতুতার বর্ণনায় জানা যায়, মহম্মদ বিন তুঘলগের রাজত্বে (রাজত্বকাল ১৩২৭—১৩৫০) চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে সরকারি প্রয়োজনে ডাকের ব্যবস্থা ছিল। বতুতা দেখেছিলেন দু রকমের পত্রবাহক—ঘোড়সওয়ার এবং পায়ে হেঁটে যাওয়া। ঘোড়ায় চড়া পিওন চার মাইল গিয়ে অপেক্ষমান আর এক অশ্বারোহী পিওনকে দিত আর পায়ে চলা পত্রবাহকরা থাকত এক মাইল পর পর।

শের শাহের রাজত্বে (১৫৪১—১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা থেকে সেই সুদূর সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত সুদীর্ঘ দু হাজার মাইল প্রশস্ত পথ তৈরি হয়েছিল। সেই রাস্তার প্রতি দু মাইল অন্তর দুটি করে ঘোড়সওয়ার ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকত। এই দীর্ঘ সড়ক এবং ডাক নেবার জন্য ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে শের শাহ চিঠিপত্র আদান-প্রদানের গতি দ্রুততর করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সময়

দশ মাইল পর পর ঘোড়ার ডাকের আড্ডা ছিল। তোমরা যদি কখনো আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রায় যাও দেখবে পথের ধারে সাবেক স্মৃতি বহন করে এখনো মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ঘোড়ার ডাকের একটি আড্ডার ধ্বংসস্তূপ।

শুরু হল ইংরেজদের কোম্পানির রাজত্ব। ইংরেজরা চিঠিপত্র চলাচলের ওপর খুব গুরুত্ব দিল। এত বড় দেশ। দূর দূরান্তে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের বসতি। যোগাযোগের ব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে না পারলে যেকোন মুহূর্তে কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ সুশৃঙ্খলভাবে ডাকের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন জমিদারদের কাছে গেল কোম্পানির নির্দেশ আপনাদের এলাকার ভেতর দিয়ে ডাক বহন করার জন্য হরকরা দিন। যাঁরা যত বেশি হরকরা দেবেন, সেই পরিমাণ খাজনা তাদের মাপ করা হবে।

যাই করুক গোড়ার দিকের ইংরেজ কর্তারা আর যতটুকুই করুক সেসব শুধু সরকারি বা গভর্ণমেণ্ট ডাকের জন্য। দেশের সাধারণ মানুষ সেই ডাকে চিঠিপত্র পাঠাতে পারত না কখনো। তবে পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ী জবরদস্ত ক্লাইভ সাহেব অনিয়মিত ডাক ব্যবস্থাকে কিছুটা নিয়মের ভেতরে এনেছিলেন। কোম্পানির সব দপ্তরে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সব চিঠি যেন রাজভবনের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠান হয়। সেখানে থাকবেন একজন পোস্টমাস্টার। সারা রাত জেগে তিনি চিঠিগুলি বাছাই করে সকালবেলা ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন।

ক্লাইভের পর বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনিই বাংলা তথা ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। পার্শী ভাষায় মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। আর যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনি ছিল সংগঠনী শক্তি। দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত বা সমস্ত বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজালেন। চালু করলেন জেলায় জেলায় খাজনা আদায়ের নতুন ব্যবস্থা। এহেন হেস্টিংস ডাকবিলির নড়বড়ে ব্যবস্থার দিকে মনযোগ দেবেন না—তা কি হতে পারে?

এল ১৭৭৪ সাল। হেস্টিংস ডাকবিভাগের সর্বময়কর্তা বা পোস্টমাস্টার জেনারেলের পদ সৃষ্টি করে সারা দেশ জুড়ে এলোপাথাড়ি চলতি অবস্থাকে পাল্টে ডাকবিলির ব্যবস্থাকে একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের ভেতরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন।

নিয়ম অনুসারে সরকারি ডাকের সঙ্গে কোন লোক তার চিঠিপত্র পাঠাতে পারত না। তবুও হোমরা চোমরা চাকরেরা হয়ত লুকিয়ে ছাপিয়ে একটা-দুটো চিঠি পাঠাত। হেস্টিংস নির্দেশ দিলেন খুব প্রয়োজন হলে উপযুক্ত মাশুল দিয়ে যে কেউ চিঠি দিতে পারবে। তাঁর সেই হুকুমেই সেই প্রথম জনসাধারণ ডাকের কিছুটা সুযোগ পেলে ডাকবিলির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হল।

কিন্তু ডাকটিকিট তখনো জন্মায়নি। ঠিক হল—একটি চিঠির জন্য প্রতি একশো মাইলে দুই আনা করে মাশুল দিতে হবে। কিন্তু ডাকটিকিট তো নেই। চার্জ নেওয়া হবে কি করে?

হল আরও একটা অভিনব ব্যবস্থা—চিঠির সঙ্গে তার চার্জ বা মাশুলটি জমা দিলেই পোস্টমাস্টার একটি তামার পাত বেঁধে দেবেন সেই চিঠিতে। সে সময় অর্থাৎ দুশো বছর আগে শুধু চিঠির জন্যই কলকাতার পোস্ট অফিস খোলা থাকত ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত। আবার ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

পোস্টমাস্টার সন্ধে ছটা নাগাদ তাঁর কেরানীদের নিয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসের পোস্ট অফিসে আসতেন। চিঠিগুলির ঠিকানা অনুযায়ী বেছে নিয়ে এক একটা বড় পুলিন্দা বা প্যাকেট তৈরি করে হাঁটা পথেই ডাকবাহক বা ডাকহরকরা মারফত রওনা করিয়ে দিতেন।

হরকরা অর্থাৎ যে ডাক বহন করে দূরদূরান্তরে নিয়ে যায়, তাদের ছিল যেমন বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি দুর্দান্ত সাহস। তাদের হাতে থাকত ঘুঙুর বাঁধা একটি বল্লম। বল্লমটি তাদের দেওয়া হত আত্মরক্ষার জন্য। সাপখোপ, বাঘ-ভাল্লুক অধ্যুষিত গভীর বনের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হত। আর ঘুঙুরটি ছিল সে যে ডাক নিয়ে আসছে, তার সঙ্কেত। সেই শব্দ শুনে তার পরের হরকরা তৈরি হয়ে থাকত। সময় একেবারে নষ্ট হত না।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, ডাকহরকরাদের কেমন অপরিসীম কর্তব্যনিষ্ঠা আর কেমন নিজের জীবন তুচ্ছ করে কাজ করতে হত।

এক ডাকহরকরাকে গভীর এক বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয় বিকেলে। সেই বনের ধারেই একটি গ্রাম। কিছুদিন থেকেই একটা মানুষ খেকো বাঘ সেই গ্রামে খুবই উৎপাত করতে শুরু করল। পর পর দুদিন দুটো লোককে খেয়ে ফেলল। গোয়ালঘরে ঢুকে গরু নিয়ে গেল তিনটে।

বাঘটার মজা হল—প্রতিদিন বিকেলেই সে শিকারের খোঁজে বেরোয়। গ্রামের বুড়ো মানুষরা হরকরাকে বলল—বিকেলে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না—তুমি আজ রাতটুকু গ্রামে কাটিয়ে কাল সকালে যেও। তা কি করে হয়—ডাকহরকরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কত লোকের জরুরী চিঠিপত্র আছে—তাদের কত অসুবিধা হবে বলেই ডাকের বোঝা নিয়ে সে রওনা হল। কিন্তু বেশি দূরে যেতে হল না। বনের ভেতর দিয়ে একটু যেতেই বাঘের পেটে গেল।

তখনকার দিনের কাগজে ছাপা হয়েছিল এই শোচনীয় দুর্ঘটনার খবর। আর এই ডাকহরকরার সাহসের প্রশংসা, তার কর্তব্যনিষ্ঠার কথা পৌঁছে গিয়েছিল সাগর পেরিয়ে সুদূর ইংল্যাণ্ডে।

কোথাও কোথাও আবার ডাকহরকরারা চার পাঁচজন মিলে যেত। জানো তো হিমাচল প্রদেশের আরও উত্তরে যেমন প্রবল তুষারপাত হয়, তেমনি হয় তুষারের ঝড়।

ডাকহরকরারা পথ চলছিল একসঙ্গে। হঠাৎ শুরু হল বরফের ঝড়। সেই ঝড়ের বেগ আমাদের কালবৈশাখীর চেয়ে অনেক বেশি। যত জোরেই ঝড় হোক ডাকের দেরী হবে। তাই তারা প্রাণপণ জোরে হাঁটছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত বরফের কুচি ঝড়ো বাতাসে আছড়ে পড়ছে তাদের নাকে মুখে চোখে। ঝড়ের এত প্রচণ্ড বেগ যে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ভয় পেয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। শুধু একজন পারল না। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস সেই হরকরাকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে ফেলল একটা খাদে। সামরিক বাহিনীর রেসকিউ পার্টির লোকেরা অনেক খুঁজে তাকে পেয়েছিল। দেখা গেল তার একটি পা নেই।

আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিমানে, রেলে, জাহাজে, স্টিমারে পৃথিবীর অতি অল্পসময়ে দূরতম প্রান্তেও চিঠি পৌঁছে যাচ্ছে—আর প্রাচীন দিনের সেই যারা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার খবর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিত তারা হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলান্তে।

তবে কি জান, এখনও দূরদূরান্তরের গ্রামে-গঞ্জে ডাকহরকরাই চিঠিপত্রের বোঝা বহন করে। পুরনো একটি সরকারি দলিলে দেখা যায় বত্রিশ বছর আগেও (১৯৫২) ৯.২৬৪ জন হরকরা ছিল। এখনও আছে, তবে সংখ্যা অনেক অনেক কমে গিয়েছে।

* * *

এবার আবার কলকাতার পোস্ট অফিসের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। ক্লাইভ এবং হেস্টিংসের আমলে অর্থাৎ একেবারে ইংরেজদের রাজত্বের আদি যুগে কলকাতার প্রাচীনতম পোস্ট অফিস ছিল গভর্ণমেণ্ট হাউস। কিন্তু এই গভর্ণমেণ্ট হাউসটি কোথায় ছিল? তাহলেই আবার ফিরে যেতে হয় কলকাতার গোড়ার দিকের ইতিহাসে। একেবারে প্রথমে

গভর্ণমেন্ট হাউস ছিল ইংরেজদের পুরনো কেল্লা সাবেক ফোর্ট উইলিয়মের ভেতরে। এখন যেখানে ঘড়ি বসানো গম্বুজওয়ালা জি পি ও-র বাড়ি এবং কাস্টমস হাউসটা জুড়ে জমিটায় ছিল প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম। ১৭১৭ সালে বিদেশী এক ব্যবসায়ী আলেকজান্দার হ্যামিলটন কলকাতায় এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন ইংরেজদের এই দুর্গের শক্ত মজবুত চেহারার।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করে কামান দেগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই কেল্লার কোন কোন জায়গা। ফোর্টের ভেতরে গভর্ণরের বাংলোটিও বাসের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৭ সালে সাবেক কেল্লার দক্ষিণে অর্থাৎ আধুনিককালের কয়লাঘাটা স্ট্রিটে গঙ্গার ধারে তৈরি হল নতুন বাংলো। কিন্তু দশ বছর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কিন্তু ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস সাহেব যেই জনসাধারণের সঙ্গে ডাক ব্যবস্থার যোগাযোগ করে দিলেন অমনি পোস্ট অফিসও বেরিয়ে এল লাটসাহেবের বাড়ি থেকে। সে সময় এখানে সেখানে নানা ভাড়াটে বাড়িতে পোস্ট অফিসের কাজ চলেছে। কোথায় কোথায় এবং কোন কোন বাড়িতে কতদিনের জন্য পোস্ট অফিস বসেছিল তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এখনকার জি পি ও-র এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল ক্লাইভ হেস্টিংসের আমলের প্রায় একশ বছর পরে। এবং তৈরি হয়েছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। সে ইতিহাস খুব বিচিত্র।

তার আগে বলা দরকার— ১৮২৭ সালেই ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ইংরেজদের শাসন ছড়িয়ে পড়েছিল। এত বড় এলাকার বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় শহরের মধ্যে শুধু এক জায়গায় এক একরকম ব্যবস্থা, এক এক রকমের মাশুল ছিল। আবার কোথাও কোথাও গভর্ণমেন্ট কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানকে ডাক-ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন। ১৭৮০-৮১ সালে গভর্ণমেন্ট বেকন নামে এক ভদ্রলোককে কলকাতা থেকে ডাক আনা-নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। বেকন ঘোড়ার পিঠে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার ১৮২৯ সালে কলকাতায় ডাকবিলির দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য পেয়েছিল রোজারিও কোম্পানী। তখনকার দিনের একটি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা (বঙ্গদূত ৬ জুন, ১৮২৯) এই রোজারিও কোম্পানী সম্বন্ধে লিখেছিল—'রোজারিও কোম্পানী এক আনা মাশুল লইয়া কলকাতার মধ্যে এবং নিকটবর্তী স্থলে—দমদম, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া এবং শিবপুরে চিঠি বাটিয়া দিবেন…।'

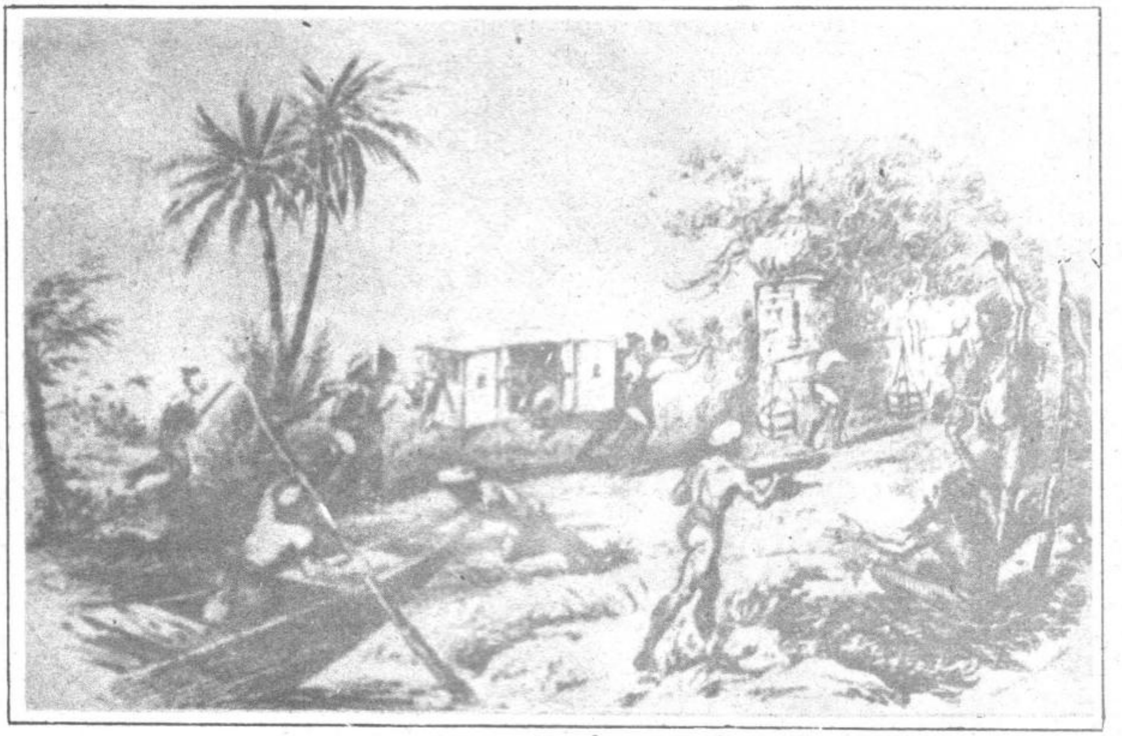

১৮৩২ সালে ডাক যেত পালকিতে আর নৌকায়

যেতে না যেতেই সে বাড়িও জীর্ণ হয়ে পড়ল। আবার বর্তমান গভর্ণর হাউসের কাছেই একটা জমিতে তৈরি করা হল ইংরেজদের বড় কর্তার আর একটি নতুন বাংলো। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের একটি মানচিত্রে দেখা যায় এখনকার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট এবং কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের মাঝামাঝি কোন জমিতে ছিল গভর্ণমেন্ট হাউস। তবে এখনকার লাটসাহেবের বাড়ির মত অত বড় বাগানঘেরা বাড়ি ছিল না।

গভর্ণমেন্ট হাউস এক একবার এক এক জায়গায় গড়ে উঠছে, পোস্ট অফিসও তার সরকারি চিঠি এবং পার্শেল চলাচলের ব্যবস্থাই ছিল খাস গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব। কোন কোন লোককে খাতির করে এই সরকারি ডাকের সুযোগ দেওয়া হত। বড় বড় শহরের পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব ছিল এই সরকারি চিঠির। আর জেলায় জেলায় স্থানীয় ডাকের দায়িত্ব ছিল জমিদারদের। জেলার বিভিন্ন থানার- সঙ্গে জেলা শহরের ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করতেন জমিদাররা। তাদের কাজ দেখাশোনা করতেন জেলার কালেক্টর। ডাকঘর এবং ডাকলাইনের মূল দায়িত্ব ছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের। কাজেই এক

১৮৩৭ সাল। সরকার থেকে জারী হল নতুন আইন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সব জায়গায় ডাকবিলির ব্যবস্থা করা গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব। বেসরকারি ডাক বেআইনী ঘোষণা করে দেওয়া হল। এইবার ডাকঘরের কাজ অনেক অনেক বেড়ে গেল।

ওদিকে শহর কলকাতাও দিনে দিনে জাঁকিয়ে উঠতে লাগল। বেড়ে গেল লোকসংখ্যা আর ভাড়াটে বাড়িতে পোস্ট অফিসের কাজ চালানো দায় হয়ে উঠল। আবার গভর্ণমেন্টও ডাক-ব্যবস্থার নিত্যি নতুন আইন করতে লাগল। যেমন দূরত্ব অনুযায়ী

এক এক জায়গায় এক একরকম চার্জ উঠিয়ে দিয়ে সব জায়গায় একরকম মাশুল করা হল। অবশ্য ওজন অনুসারে চার্জ কমবেশি হত যা এখনও আছে। আর ঠিক এই সময়ে (১৮৫৪ সালে) প্রচলন হল ডাকটিকিটের। কাজ অনেক। তাই কেরানীর সংখ্যা বাড়াতে হল। বাড়াতে হল পিওনের সংখ্যা। পোস্ট অফিসের একটি নিজস্ব বড় বাড়ি না হলেই আর চলছে না। তাই তখনকার পোস্ট মাস্টার জেনারেল (১৮৬০) এইচ বি রিডল সাহেব লিখলেন বিলেতে ভারত সরকারের সেক্রেটারি মিস্টার গ্রে কে-বর্তমানে গ্যারেট সাহেবের (গ্যারেট সাহেবের বাড়ি কোথায় ছিল—জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় আধুনিককালের বি বা দী বাগে যেখানে সাহেব টাউন গড়ে উঠেছিল সেই অঞ্চলেরই কোথাও হবে।) বাড়িতে যেখানে পোস্ট অফিস আছে সেখানে যে স্থানসংকুলান হচ্ছে না এবং কাজের খুব অসুবিধা হচ্ছে—তা আপনাকে বছর ছয়েক আগেই (১৮৫৪) জানিয়েছিলাম। এখন কাজ যেমন দ্বিগুণ তেমনি স্টাফের সংখ্যাও ডবল হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গ্যারেটসাহেব ছোটখাট কিছু অলটারেশন করে দিয়ে কিছু জায়গা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং দুটো ছোট ছোট ঘরও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাড়িটাই এত ছোট আর ঘিঞ্জি যে পোস্ট অফিসের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জায়গা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বিশেষ করে চিঠি রিসিপ্ট বা চিঠি নেওয়া। চিঠি বাছাই করার ঘর যেমন ছোট, তেমনি তার মেঝে খুব স্যাঁতসেঁতে ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আমি নিজেই সেখানে মিনিট পনেরর বেশি থাকতে পারিনি—প্রবল কাশির দমকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছি। তবে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর শুধু এই যুক্তিই নয় কলকাতার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে যাওয়া পোস্ট অফিসের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জায়গা এই বাড়িতে হচ্ছে না বলেই নিজস্ব একটা বড় বাড়ি তৈরি করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

★

এই চিঠির পরেও পোস্ট অফিসের নতুন বাড়ি তৈরির অনুমতি পেতে আরও চার চারটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে এল নির্দেশ। শুরু হল বাড়ি তৈরির কাজ। বাড়ির ডিজাইন এবং প্ল্যান করলেন ভারত সরকারের বিখ্যাত স্থপতি ডবলিউ বি গ্র্যাণ্ডভিলে। মোট খরচ পড়েছিল ছ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। এই জি পি ও-র বাড়ির জমিতে ইংরেজদের জীর্ণ সাবেক কেল্লাটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত মজবুত তার দেওয়াল। শাবল আর গাঁইতি চালিয়ে কিছুতেই ভাঙা গেল না তার দেওয়াল। শেষ পর্যন্ত বোমা মেরে ভাঙতে হয়েছিল পুরনো দুর্গের শক্ত দেওয়াল আর ছাদ। পুরো চার বছর লেগেছিল জি পি ও-র বাড়ি তৈরি হতে। ১৮৬৮-১৮৬৯ সালের পি ডবলিউ ডি-র (পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট) বার্ষিক বিবরণীতে আছে—সুদীর্ঘ চার বছর (১৮৬৮) পরে কলকাতায় পূর্বভারতের বৃহত্তম ডাকঘর—জেনারেল পোস্ট অফিসের অতিকায় সৌধ তৈরি শেষ হল। অষ্টভুজ (আট কোণা) বিশিষ্ট ইমারতের ছাদ এবং দেওয়ালের সংযোগস্থলে আছে সুদৃশ্য কারুকার্য। গ্রীসের করিন্থ নগরের প্রাসাদ শ্রেণীর স্তম্ভের স্টাইলে তৈরি এই বাড়ির প্রতিটি অতিকায় পিলার। ছাদের ওপরে বিশাল গম্বুজ। তার পাশে ফিট করা আছে এমন একটি বিচিত্র ঘড়ি যার চারটি ডায়াল। তিনটি ডায়াল বাইরে থেকে দেখা যায়, পূর্ব আর পশ্চিম দিকের ডায়াল ঘোষণা করে কলকাতার স্থানীয় সময় বা লোক্যাল টাইম আর দক্ষিণমুখী ডায়াল জানিয়ে দেয় ভারতীয় সময় বা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।

তখনকার কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ইংলিশম্যান' লিখল—যদিও কেউ কেউ হাতির পায়ের মত বিশাল বিশাল থামওয়ালা সিনেট হাউস বা পার্লামেন্ট ভবনের মত এত বড় ইমারত পোস্ট অফিসের কোন প্রয়োজন ছিল না বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন. কিন্তু আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি আমাদের মনে হয়েছে দিনে দিনে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে যাওয়া কলকাতা শহরের চাহিদা পূরণ করতে পারবে কয়লাঘাট স্ট্রিট এবং ডালহৌসির পশ্চিমদিক জুড়ে এই বিশাল সর্বাধুনিক বাড়ি।

★

যত বড় আর যত সুন্দর বাড়িই হোক—জি পি ও-র কলকাতার প্রথম পোস্ট অফিসের কাজকর্মের ফিরিস্তি শুনলে কিন্তু তোমাদের হাসি পাবে। তবুও এই শহরের সঙ্গেই প্রথম ডাকঘরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আজ বাড়ির লেটার বক্স খুললেই দূর দূর দেশ দেশান্তরের আত্মীয় পরিজন বন্ধুদের চিঠি দেখতে পাও। তোমাদের এলাকার পিওন কখন নির্ভুল নিয়মে তোমার নামের চিঠি তোমাদের চিঠির বাক্সে রেখে গিয়েছে তুমি জানতেও পার না। কিন্তু একশো কি সওয়া একশো বছর আগে চিঠি এবং পার্শেলের বোঝা পিওন চাপিয়ে দিত গরুর গাড়ির ওপরে। সেই গাড়ি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত আর পিওন বেল বাজিয়ে বাজিয়ে সঙ্কেত দিত—চিঠি বিলি হচ্ছে। যে বাড়ির চিঠি আছে সেই বাড়িতে গিয়ে আরও জোরে জোরে বেল বাজিয়ে চিঠি নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করত।

আরও ছিল মজার কাণ্ড—সাহেবরা বিলেতের চিঠির জন্য যেমন হাপিত্যেশ করে বসে থাকত। তেমনি লণ্ডনে চিঠি পাঠাবার জন্য করত আকুলি বিকুলি। তাই জি পি ও-র বড়কর্তা করতেন কি জান? বিলেত থেকে চিঠি নিয়ে বোম্বাইতে পৌঁছলেই জি পি ও-র বাড়ির উত্তর-পূর্ব টাওয়ারে তিনটি ক্রস চিহ্ন বসান লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হত যতক্ষণ সেই ডাক কলকাতায় না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ সেই পতাকা উড়তেই থাকবে—আবার যখন সেই লাল পতাকা সরিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজার মুকুটের আর তার নিচে বিউগিলের ছবি আঁকা সাদা পতাকা দক্ষিণ-পূর্ব টাওয়ারে উড়বে তখন বুঝতে হবে বিলেতের চিঠি জি পি ওতে জমা পড়ছে। এই সাদা পতাকা উড়তে থাকবে বুধবার দিন ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত।

চিঠি দেওয়া নেওয়ার কত মজার রকমারি ব্যবস্থার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার প্রথম ডাকঘর জি পি ও-র এই ঐতিহাসিক বাড়ি। একশো ষোল বছরের বর্ষার জলে রোদে ঝড়ে এতটুকু ম্লান হয়নি এই বিশাল সৌধ—নির্ভুল নিয়মে লক্ষ লক্ষ পথচারীকে সে সময়ের নিশানা দিয়ে চলেছে তার লালদীঘির জলে তার উল্টো ছায়া বাতাসে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে ঠিক সাবেক দিনের মত।

# কিশোর মন

## হরেন ঘটক

'কিশোর মন'-এর আবির্ভাবে
বৈশাখ এবার জমজমাট,
প্রতি মাসে দুবার এসে
জমিয়ে দেবে খুশীর হাট।

আয় চলে আয় কিশোর যত
'কিশোর মন'-ই মনের মত
নিজেরা সব নে বুঝে আজ—
'কিশোর মন'-এর রাজ্যপাট।
উঠুক জমে খুশীর হাট ॥

আজকে যারা কিশোর তারা
কালকে জাতির কর্ণধার,
'কিশোর মন'-ই খুলে দিল
জ্ঞানার্জনের সিংহদ্বার।

এদের গড়ে তুললে তবে
বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ হবে
আমাদের এই ভারতভূমি—
তুচ্ছ তো নয়—দেশ বিরাট।
জমবে তবেই খুশীর হাট ॥

# কাঠপুতুলের ছড়া

## সরল দে

আয় রে পুতুল লক্ষ্মী পুতুল
উকুন দেবো বেছে,
ইস্টিসানের হট্টমেলায়
বেড়াস নেচে নেচে।

তুলোর হাতি কোথায় পাবো
ধুলোর খেলাঘরে?
একটা দুটো ঘেয়ো কুকুর
ঘেউ ঘেউ ঘেউ করে।

আমার মা সে ফিরছে না তো—
কোথায় গেছে চ'লে।
তোর মা আমি, কাছেই আছি,
এই নিয়েছি কোলে।

রঙচটা তুই দুঃখী পুতুল
ধুলোয় মাখামাখি।
চাইনে রাজা-পুতুল আমি
তোকেই নিয়ে থাকি।

আয় রে আমার লক্ষ্মী সোনা
চাঁদের কণা ওরে,
ঘুম যা এখন, বর আসবে
লাল টুকটুক ভোরে ॥

ছবি : তরুণ চক্রবর্তী

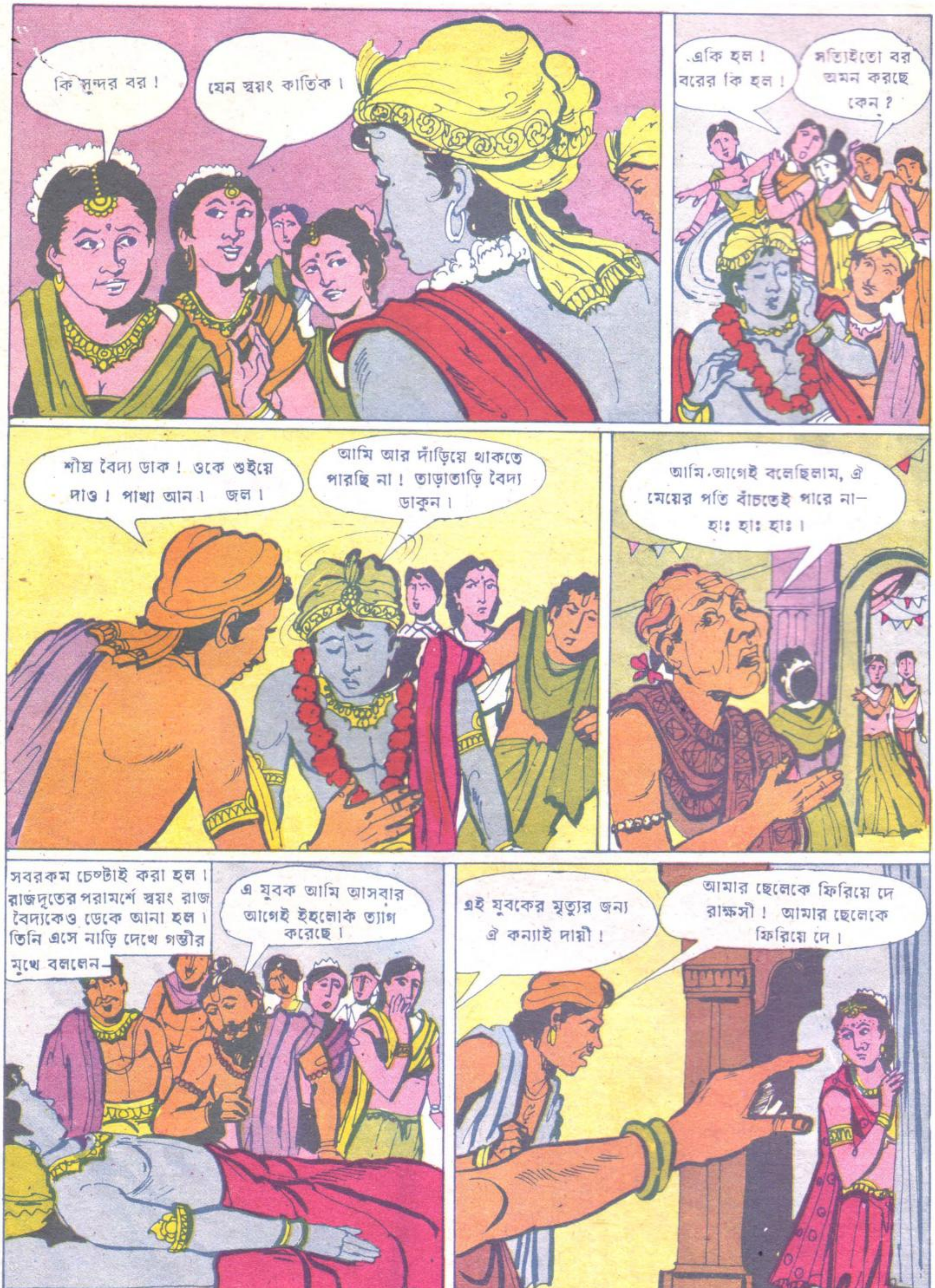
কি সুন্দর বর !
যেন স্বয়ং কার্তিক।
একি হল ! বরের কি হল !
সত্যিইতো বর অমন করছে কেন ?
শীঘ্র বৈদ্য ডাক ! ওকে শুইয়ে দাও ! পাখা আন ! জল !
আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না ! তাড়াতাড়ি বৈদ্য ডাকুন !
আমি আগেই বলেছিলাম, ঐ মেয়ের পতি বাঁচতেই পারে না— হাঃ হাঃ হাঃ !
সবরকম চেষ্টাই করা হল। রাজদূতের পরামর্শে স্বয়ং রাজবৈদ্যকেও ডেকে আনা হল। তিনি এসে নাড়ি দেখে গম্ভীর মুখে বললেন—
এ যুবক আমি আসবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে।
এই যুবকের মৃত্যুর জন্য ঐ কন্যাই দায়ী !
আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে রাক্ষসী ! আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে।

আমি তো আগেই বলেছিলাম ! ও রাক্ষুসী ! এখুনি ওকে মেরে তাড়াও । নইলে পুরো গ্রাম উজাড় করে দেবে ।
কি সর্বনাশ ! বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের কন্যা রাক্ষসী ! এযে স্বপ্নেরও অতীত ছিল ।
ক্রমে এ বিশ্বাসটাই ছড়িয়ে পড়ল সকলের মধ্যে । তারা সুভাগাকেই দায়ী করল যুবকের মৃত্যুর জন্য । ব্রাহ্মণেরা তার গ্রামত্যাগ দাবী করল। কিন্তু সুভাগা রুখে দাঁড়াল । যার সঙ্গে তার বিয়েই হয়নি, তার মৃত্যুর জন্য সে কি করে দায়ী হতে পারে ? এ যুক্তিতে তারা আরও ক্ষুব্ধ হল । তারা বলপ্রয়োগ করল ।
আমাকে বলে দাও, বাপের বাড়ি বা গ্রাম ছেড়ে আমি কোথায় যাব !
সে জায়গা দেখাবার দায় কি আমাদের !
মারো, মেরে তাড়াও ।

এরপর....৫০ পৃষ্ঠায়

নিষ্ঠুর পৃথিবীতে পরম উপলব্ধির করুণ মধুর উপন্যাস

# দূর ফুলের গন্ধ

## শিশিরকুমার মজুমদার

স্কুল থেকে বাড়ির কাছ পর্যন্ত পৌঁছেই হীরক থমকে দাঁড়াল। একি, ওদের বাড়ির সামনে এত ভীড় কেন ? দরজার সামনে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের অনেককেই ও চেনে। ওই তো পাপুর বাবা হারু জ্যাঠা, পাশেই তাঁর বনমালীবাবু, ওদিকে নারানদা, তার পেছনে রবিকাকা। আরও কত কে। সবাই তো এ পাড়ার বাসিন্দা। কি হয়েছে ওদের বাড়িতে !

কেমন যেন ভয় ধরে গেল হীরকের। নিশ্চয়ই ভীষণ কিছু একটা ঘটেছে। হাতের বইগুলো বগলে চেপে ধরে ও যেই হন হন করে এগোতে যাবে, পাশের বাড়ির মণিমাসী জানালা দিয়ে ডাকলেন, 'হিরু এদিকে আয়, শুনে যা তো বাবা। কথা আছে।'

বেশ বিরক্তি নিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল হীরক। বলল, 'বলুন, কি বলবেন ?'

'এই ফিরছিস স্কুল থেকে ?' জিজ্ঞাসা করলেন মণিমাসী।

মণিমাসী ওর কেউ হয় না। পাড়ার অন্যসব বড়দেরও যেমন কাকা, মামা, জেঠু বলে ডাকে, তেমনি চৌধুরীদের বাড়ির ওঁকেও মাসী বলে ডাকে। এ মাসী ওর মার থেকেও অনেক বড়। কেন যেন ওকে একদম ভাল লাগে না হীরকের। আজ উনি দেখছেন ও স্কুল থেকেই বই খাতা হাতে ফিরছে তবুও জিজ্ঞাসা করছেন স্কুল থেকে ফিরছে কিনা ! রাগ চেপে হীরক বলল, 'হ্যাঁ মাসী। আমাদের বাড়িতে কি হয়েছে মাসী ?'

'তোদের বাড়িতে !' আকাশ থেকে পড়লেন যেন মণিমাসী, বললেন, 'কই কী হয়েছে তা তো আমি জানি না। ও কথা জিজ্ঞাসা করলি কেন ?'

'আমাদের বাড়ির সামনে সবাই ভীড় করছে, হারু জ্যাঠা, বনমালী কাকু, নারানদা, রবিকাকা আরও অনেকে· কি হয়েছে মণিমাসী ?'

একটু থমকে থেকে মণিমাসী ডাকলেন, 'আয় ভিতরে আয়। মালপোয়া ভেজেছি দুখানা খেয়ে যা। কী আবার হবে ? এমনি হয়ত সবাই এক হয়ে আড্ডা মারছে। তুই আয় ভিতরে। দুখানা মালপোয়া খেয়ে যা। কত আর দেরি হবে।'

মালপোয়ার কথা শুনে একটু ইতস্তত করল হীরক। কী আর হবে বাড়িতে ? খারাপ কিছু হলে কি আর মণিমাসী জানতেন না ৷ পাশের দরজা খুলে মণিমাসী ডাকলেন, 'আয়, আয়। ওমা তাই তো, ভীড় তো হয়েছেই দেখছি। খেয়ে গিয়ে দেখ, মনে হয় কেউ এসেছে হয় তো।'

মালপোয়ার লোভ আর সামলাতে পারল না হীরক। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে, মাসীর পিছন পিছন বৈঠকখানা ঘরে এসে বসল। মণি-মাসী-ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিলু ফিরেছে বাড়ি ?'

মিলু, মিলন, হীরকের ছোট বোন। ক্লাস টুতে পড়ে। ও তো সকালে স্কুলে যায় বুড়ো রিক্সাওয়ালার রিক্সা চড়ে। ফেরেও তার রিক্সা চড়েই। সেও দুপুরের আগেই। এ কথা তো মাসী জানেন। তবে

কেন আজ আবার তা ওকে জিজ্ঞাসা করছেন ? কি হয়েছে আজ মণিমাসীর ! ও আর ওঁর কথার উত্তরই দিল না। তবুও ওকে অবাক করে দিয়ে মণিমাসী হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর বয়স কত হয়েছে রে ?'

কোথায় মালপোয়া খেতে দেবেন, তা না যা তা সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন উনি। হীরক বলল, 'আমার বয়স নয়। মিলুর পাঁচ। আমি এখন যাই মণিমাসী। আর একদিন এসে মালপোয়া খাব।'

'না না বোস।' ব্যস্ত হয়ে মণিমাসী ওর হাত ধরে ওকে ফের বসিয়ে দিলেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, 'এখন বাড়ি যাস না। পরে যাস। এখন আমার সঙ্গে বসে বসে কথা বল।'

ওর কথা শেষ হতেই পাশের ঘর থেকে বার হয়ে এলেন অমল মেসোমশাই। বললেন, 'ওকে আটকিও না, যেতেই দাও। ওর ওখানে কাজ আছে।'

'কি বলছ তুমি ? অতটুকু ছেলে, ওর আবার ওখানে কি কাজ থাকতে পারে ? যা হবার তা তো হয়েইছে। ও এখন এখানেই থাক। পরে যাবে।' কেমন করে যেন বললেন মণিমাসী।

ভীষণ ভয় পেয়ে হীরক বলল, বাড়িতে কি হয়েছে মাসী ? কি হয়েছে মেসোমশাই ? আমি বাড়ি যাব।'

মণিমাসী আর কিছু বলার আগেই অমলমেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, হীরক বাড়ি যাবে তুমি। চল আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

মণিমাসী আর কিছু বলার আগেই হীরক তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল। নেমেই দেখল ওদের বাড়ির সামনের ভীড় যেন আরও বেড়েছে। পাড়ার সবাই যেন এসে জড়ো হয়েছে ওদের বাড়ির সামনে। থাকতে না পেরে হীরক জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কি হয়েছে মেসোমশাই ?'

অমলমেসোমশাই একবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হিরু, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তোমাদের বাড়িতে। তোমার বাবা অফিস গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে মারা গেছেন। তাঁকে বাড়িতে আনা হয়েছে। তুমি তো বড় হয়েছ, তুমি কিন্তু বেশি কান্নাকাটি করবে না। তাতে তোমার মা আর বোনের খুব কষ্ট হবে। বুঝলে ?'

বাবা ওর মারা গেছেন ! কথাটা বিশ্বাসই করতে পারল না হীরক। পুটুদের দাদু তো মারা গিয়েছিলেন কদিন আগে। তাঁর তো মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। দাঁত পড়ে গিয়েছিল। অনেক বয়স হয়েছিল। উঠে চলাফেরা করতেও পারতেন না তেমন।

কিন্তু ওর বাবার তো মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়েছিল। সারাদিন এ কোম্পানি ও কোম্পানি করে মাল সাপ্লাই দিতেন। সে যে ঠিক কি কাজ তা অবশ্য হীরক জানে না। জানে, বাবা ওর কোথাও চাকরি করতেন না, গুপ্ত অ্যাণ্ড সন নামে একটা ছোট্ট কোম্পানি ছিল ওর বাবার, এখানে ওখানে মাল যোগান দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। গুপ্ত হচ্ছে ওর বাবা নিজে, শ্রীযুক্ত নীলোৎপল গুপ্ত ; আর সন হচ্ছে ও নিজে, শ্রীহীরক গুপ্ত। বাবা বলতেন ওঁর ছোট্ট কোম্পানি একদিন খুব বড় হবে। তখন হীরকই তার সব কাজ দেখাশুনা করবে। বাবাই ওর মরে গেল তো এখন কী হবে ?

বাড়ির কাছে পৌঁছাতেই হারুজ্যাঠা এগিয়ে এসে ওর মাথায় কেন যেন হাত রাখলেন। বললেন, 'যা বাবা ভিতরে যা। মার কাছে গিয়ে একটু বোস। তোর বোনকে দেখছি না কেন ? তাকেও সঙ্গে নিয়ে যা।'

ও ভেতরে ঢোকার আগেই শুনতে পেল অমলমেসোমশাই হারু জ্যাঠাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রওনা হতে আর কত দেরী ? মিছিমিছি দেরী করা ঠিক নয়।'

হারু জ্যাঠা বলল, 'ওদের মামার কাছে খবর নিয়ে লোক গেছে। তিনি এলেই রওনা হব। এখন দেখ কখন আসেন তিনি।'

ঘরে ঢুকেই থমকে গেল হীরক। একটা দড়ির খাটিয়ায় আরও দড়ি বাঁধছে ফুটুদা আর তার দলের অন্যরা। ফুটুদাকে এ পাড়ায় সবাই ভয় করে। কেউ ওর সঙ্গে ওর দলের লোকদের সঙ্গে কথাই বলে না আড়ালে সবাই ওকে বলে ফুটো মস্তান। সে নাকি খুব খারাপ কথা। শুনলেই ফুটুদা ভীষণ রেগে যায়। মারতে তেড়ে আসে। একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় কমল ওকে বলেছিল ফুটুদাকে ফুটো মস্তান বলে ডাকতে পারলে ওর কম্পাস লাগান ফাউন্টেন পেনটা ওকে একদম দিয়ে দেবে। তখন সবে এ পাড়ায় এসেছে হীরকরা। বিকালে ও তো কলমের লোভে বেশ জোরেই চেঁচিয়েছিল ফুটো মস্তান বলে। তারপর যা হয়েছিল তা কোন দিনও ভুলবে না হীরক। চোখের জলে কান ধরে ওঠ-বোস করে ছাড়া পেয়েছিল পাড়ার নতুন ছেলে বলে। আর এমন পাজী কমল, কম্পাস লাগান কলমটা তো দেয়নি উল্টে সবার কাছে মজা করে ওর কান ধরে ওঠ-বোস করার গল্প বলে বেড়িয়েছিল।

ফুটুদা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বলল, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? যা যা ভিতরে যা, সবাইকে তাড়াতাড়ি করতে বল। নইলে সব শেষ করে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

সে ঘর পার হয়ে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল হীরক। খাটের ওপরে বাবা শুয়ে আছেন। সারা খাট সাদা সাদা ফুলে সাজান। মাথার কাছে এক গোছা ধূপ জ্বলছে। কেমন যেন গন্ধ তার।

মেঝেতে মা ওর বসে। কোলের কাছে চুপটি করে বসে আছে মিলু। ওর চোখে কেমন যেন ভয়। ঘরের এখানে ওখানে পাড়ার সব বাড়ির কাকী, জেঠি, পিসী, মাসীরা দাঁড়িয়ে। দরজার কাছে ও এসে দাঁড়াতে মা মুখ তুলে তাকাল। মাকে দেখেই দু চোখ জ্বালা করে হীরকের চোখে জল এল। একি হয়েছে মার ? মার মুখে চোখে অমন চাহনি কেন ? হারুজ্যাঠার বউ জেঠিমা এগিয়ে এসে ওকে ধরলেন। কে যেন ওর হাত থেকে বই খাতাগুলো নিয়ে নিল। জেঠিমা ওকে টেনে এনে ওর মার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'হিরুর মা, একটু কাঁদ। কেঁদে মন হাল্কা কর। গুমরে মরিস না।'

এসব কথার মানে জানে না হীরক। তবুও ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বোধ হয় তা দেখেই ওর মা দুহাত বাড়িয়ে ওকে আর মিলুকে বুকে টেনে নিল। তারপর কাঁদতে লাগল। ভীষণ কষ্ট হল হীরকের, মাকে তো ও কখনও এমন করে কাঁদতে দেখেনি। নিশ্চয়ই মার খুব কষ্ট। তবুও হীরকের মনে হল, বাবা মরে গেছে শুনে এতক্ষণ যে ওর কি ভীষণ ভয় ভয় করছিল, মার বুকে মুখ লুকিয়ে সে ভয় ওর গেল।

এমন সময় বাইরে কেমন যেন কথা কাটাকাটি শোনা গেল। বেশ কজন লোক এসে দাঁড়াল ঘরের দরজার সামনে। তাদের সবার সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকে এর আগে আর কখনও দেখেনি হীরক। তিনি যেন বেশ রাগ নিয়েই বললেন, 'কেঁদে আর কি করবি সন্ধ্যা, যা হবার তা তো হয়েইছে। নে ওঠ, এখন ওদের কাজ করতে দে।'

মা উঠে দাঁড়াল। হুড়মুড় করে ফুটুদা তার লোকদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ধরাধরি করে বাবাকে ওরা বাইরে নিয়ে গেল। কে যেন ওদের মধ্যে বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'বল হরি, হরি বোল।'

ভীষণ ভয় পেয়ে মিলু মাকে জাপটে ধরল। ভীষণ রাগ হল হীরকের, কেন লোকটা অমন করে চেঁচাল ! ও কি জানে না ওতে সবার কত ভয় করে।

তারপর যা সব হল তা যেন আর কারও না হয়। আর কারও যেন কেউ কোন দিনও না মরে যায়। অনেক রাতে গলায় দড়িতে একটা বড় চাবি বেঁধে, নতুন কাপড় পরে সেই নতুন লোকটার হাত ধরে বাড়িতে ফিরে এল হীরক। লোকটা নাকি ওর মামা ! এমন মামা, যে কোনদিনও কখনও ওদের বাড়িতে আসেনি বাড়িতে তখন আর

কেউ ছিল না। শুধু জ্যেঠিমা একা বাইরের ঘরে আলো জেলে বসে ছিলেন। তিনি দরজায় কাছে আগুন জেলে দিলেন কাগজে। সে আগুন ছুঁয়ে মিষ্টি খেয়ে ফুটুদা তার লোকজনদের নিয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল। ঘুমে তখন চোখ জুড়ে আসছিল হীরকের। মার কাছে যাবার জন্য মন কেমন করছিল। মামা একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'সন্ধ্যা কই? ডাকুন তো তাকে। কথা আছে তার সঙ্গে।' জ্যেঠিমা বললেন, 'সে সব কথা কাল হলে হয় না?' 'না, না, আমি জানতে চাই আমি কোথায় দাঁড়িয়ে।' বললেন মামা।

'আপনি কি সন্ধ্যার দাদা?'

'হ্যাঁ, আমার দুর্ভাগ্য। ডাকুন তাকে।'

মাকে ডাকতে হল না। একাই এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। মার দিকে তাকিয়ে অবাক হল হীরক। কয়েক ঘণ্টায় একি দেখতে হয়ে গেছে মাকে ওর! এ তো চেনাই যায় না। একদম না কাচা কোরা থান কাপড় পরেছে মা। হাতে একটাও চুড়ি নেই। কানেও যে দুটো ফুল লাগান থাকত তাও নেই। তার ওপরে মুখে চোখে ওকি চাহনি! ভীষণ কান্না পেল হীরকের কিন্তু ও কাঁদতে পারল না। ও এখন কাঁদলে মার তো ভীষণ দুঃখ হবে। তা ও কিছুতেই করবে না।

মামা বললেন, 'এই যে সন্ধ্যা, এখন তোর সঙ্গে এসব কথা না বললে পরে তুই ভুল বুঝতে পারিস, তাই এখনই স্পষ্ট করে সব কিছু বলতে চাই। নিলু কোথায় কি রেখে গেছে জানি না। জানারও আমার দরকার নেই। তবে আমার কাছ থেকে তুই কিন্তু কিছু আশা করিস না। নেহাত আপনজন তাই এই একশ টাকা রেখে যাচ্ছি, যেমন ইচ্ছা খরচ করিস। হিসাব নিতে আসব না। দশ বার বছর আগে যে সম্পর্ক তুই আপনি শেষ করে এসেছিস, আজ বিপদে পড়ে তা আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।' এত কথা বলে থামলেন মামা।

'আমি তার কেউ হই না, আমি পাড়া প্রতিবেশী।'

মা দরজা ধরে চুপ করে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল। কিছু বলল না। মামা পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বার করে তা টেবিলে বই চাপা দিয়ে রাখলেন। জেঠিমা চুপ করেই ছিলেন, হঠাৎ বললেন, 'এদের এমন বিপদে এখন আপনি সরে দাঁড়ালে কি চলে?'

মামা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নিলুর কে হন?'

'আমি তার কেউ হই না, আমি পাড়া প্রতিবেশী।'

'তাহলে তা-ই থাকার চেষ্টা করুন। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। গলালেও আমি তা মানব না।' কথার শেষে কেমন করে যেন একবার তাকিয়ে মামা সোজা বাইরে বার হয়ে গেলেন। হীরকের ইচ্ছা হল একবার চেঁচিয়ে ডেকে বলে টাকাটা নিয়ে যেতে। কিন্তু বলতে পারল না। বাবা তো আর নেই ওর, এখন কে মাকে মাস মাস টাকা এনে দেবে?

জেঠিমা বললেন 'চল বাবা হিরু, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই তোর। হাত মুখ ধো, রাতে তো আর ভাত খেতে পাবি না কদিন, ফলাহার করবি যে। মিলুটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে রে সন্ধ্যা? তোল তোল, কিছু মুখে না দিয়ে শুলে পিত্তি পড়বে। তুইও মুখে চোখে জল দে সন্ধ্যা। কাঁদার অনেক সময় পাবি পরে। এখন বুক বাঁধ। কুচো দুটোকে মানুষ করতে হবে না?'

অনেক রাতে একবার ঘুম ভাঙল হীরকের। দেখল পাশের বিছানায় মা নেই। ভীষণ ভয়ে পাশ ফিরে দেখল ও মা ওর জানালার শিক ধরে একলা দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মার সারা শরীরে। কেমন যেন দেখাচ্ছে ওর মাকে। আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে ও গিয়ে দাঁড়াল ওর মার পাশে। স্পষ্ট দেখল, ওর মার দু চোখে জল চিকচিক করছে। মা তাহলে লুকিয়ে কাঁদছিল। ও আস্তে ওর মার হাতটা ধরল। তারপর কি হল কে জানে, মা ওকে আস্তে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ভীষণ কাঁদতে লাগল। কি জানি, ছোট বোনের ঘুম ভেঙে যাবে বলেই বোধহয় ওর মা ওদের মত করে কাঁদল না। কেন যেন হীরকের মনে হল তখন জেঠিমা যে মাকে কেঁদে মন হাল্কা করতে বলেছিলেন, তা ঠিক কথা। তখন ভীষণ রাগ হয়েছিল ওর মনে। এখন মনে হল জেঠিমা ওদের কেউ না হলেও খুব ভাল। ওই মামাটার মত অমন খারাপ নয়। ও যখন পড়শুনা করে অনেক বড় হবে তখন মামার ওই একশ টাকা ও নিশ্চয়ই ফেরত দিয়ে দেবে। কে চায় ওর ওই টাকা? ওদের একজন মামা আছে তা তো ওরা জানতই না। এমন মামা থাকার থেকে না থাকাই ছিল অনেক ভাল।

অনেকক্ষণ কেঁদে মা শান্ত হল। হীরক হাত দিয়ে মার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কেঁদ না মা, আমারও কান্না পায় তাহলে। এবারে শোবে চল।'

মা ওকে তেমনভাবেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হিরুরে আমাদের বড় বিপদ, বড় বিপদরে। কি যে হবে আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না।'

মার এ কথা শুনে ভীষণ অবাক হল হীরক। বিপদ মানে তো খুব খারাপ। বাবা মরে গিয়ে তো ওদের খুব বিপদই হয়েছে। কিন্তু মা

যেন আরও কি সব বলতে চাইছেন। কি যে তা, তা বুঝতে পারল না হীরক। কিন্তু বাবা তো এখন নেই, এখন ওদের বিপদ হলে কি হবে?

মাকে আর একথা জিজ্ঞাসা করতে পারল না। চুপ করে ও মার মুখের দিকেই শুধু তাকিয়ে রইল। মা বলল, 'তুই তাড়াতাড়ি বড় হ বাবা। তুই মিলু, তোরা দুজনে বড় হলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকবে না।'

এতক্ষণে বলার মত কথা পেয়ে হীরক বলল, 'ঠিক দেখো মা তুমি আমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাব। মিলু ছোট, ও পারবে না। তখন না তোমার আর দুঃখু থাকবে না। আর কেঁদ না তুমি। এখন শোবে চল।' চল না।'

বাইরে তখন ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে থালার মত বড় চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। আজ যেন চাঁদমামাকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। চাঁদে তো কেউ থাকে না। তবে মরে গেলে মানুষরা কোথায় যায়? স্বর্গে? সেই স্বর্গটা যে কোথায় কে জানে।

পরদিন দুপুর বেলা খেতে বসে মিলু বলল, 'এ্যাঃ বিচ্ছিরি, এ আমি খাব না। আমার মাচ ভাজা কই? আমি মাচ ভাজা দিয়ে ভাত খাব?'

হীরক বলল, 'এখন মাচ খায় না। এমনি এমনি ভাত খাও।'

'কেন খায় না?'

'কেউ মরে গেলে খেতে নেই।'

'কেন নেই রে দাদা?'

'বাঃ নিয়ম আছে যে।'

'নিয়ম কি রে দাদা?'

নিয়মটা যে সত্যি কী তা তো হীরকও জানে না। মাটির হাঁড়িতে ভাত যখন রান্না হচ্ছিল তখনই মা ওকে বলল, 'হিরু বাবা, এখন কদিন আর তুমি খাওয়া নিয়ে গোলমাল করবে না। কদিন যা দেব চুপ করে খাবে। এখন এমন করতে হয়। এ-ই আমাদের নিয়ম।'

কিন্তু খেতে বসেই হিরু সব কথা ভুলে গেল। এসব কি রান্না করেছে মা! ও নিজেও বোনের মত খাব না বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল মা যেন আবার কাঁদছে। বোন যাতে বুঝতে না পারে তাই অমন করে কাঁদছে। ও আর তাই খাওয়া নিয়ে কিছু বলল না। কিন্তু বোন যখন জিজ্ঞেস করল নিয়ম কি? তখন কিন্তু ও বেশ বোকা বনে গেল।

খাওয়ার সময় জেঠিমা এসে, এটা কর, ওটা করিস না, এসব কথা মাকে বলছিলেন। হীরকের মনে হল, জেঠিমা খুব ভাল। এতদিন মিছি মিছি ওকে একদম দেখতে পারত না হীরক। কারণ সবাই ওর মাকে আপনি-টাপনি বলে। খুব বড় যারা, তারাও তুমি বলে, অথচ এই জেঠিমাই সেই প্রথম দিন থেকেই ওর মাকে সেই যে তুই বলতে আরম্ভ করেছেন, তা আর কখনও ছাড়লেন না। সেই থেকে তাই ভীষণ রাগ ছিল হীরকের এই জেঠিমার উপরে। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে ওর, জেঠিমা তুই তোকারি করে কিছু ভুল করেননি। মা তো সত্যি অনেক ছোট।

খাওয়া হলে জেঠিমা চলে গেলেন। যাবার আগে হীরককে বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করতে বলে বললেন, 'এখন কদিন আর তুই স্কুলে না-ই গেলি বাবা। মিলুও যাবে না। দুজনে মার কাছটিতে থাকবি। মা কান্নাকাটি করলে বকবি।' এ কথা বলে দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে যেন আপন মনেই বললেন, 'এ কি যে করল ভগবান। ওর কি আর কান্নার শেষ হবে।' তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিকালে আসব। এসে তোদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করব। মাকে বলিস।' বলে হীরককে হাত দিয়ে ধরে খুব কাছে টেনে এনে বললেন, 'আর শোন, কেউ দেখা করতে এসে যদি কিছু টাকা পয়সা দেয় তো তা নিবি। না না করবি না বোকা। মা না করলে বলবি জেঠি নিতে বলেছে। না নিলে ভীষণ রাগ করব বলে দিলাম।' কথার শেষে হীরকের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উনি রাস্তার ওদিকের বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। হারুজ্যাঠার নিজের বাড়ি ওটা। হারুজ্যাঠারা খুব বড়লোক।

মা বলল, 'একটু শুবি খোকা?'

হীরক বলল, 'না মা, আমার ঘুম পায় না।'

মিলু বলল, 'আমি ঘুমাব মা। তুমি শোবে চল। তোমার কোলে আমি চুপটি করে ঘুমাব। তুমি কিন্তু একদম কাঁদবে না। কাঁদলেই জেঠিকে বলে দেব। জেঠি তোমাকে খুব বকবে তাহলে। হ্যাঁ।'

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে একটু শুলেন। আবার হীরকের মনে হল ওর মা ঠিক কাঁদছে। কিন্তু মিলু বুঝতে পারবে বলেই যেন কেমন করে কাঁদছে। ওর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে এসে রাস্তার ধারের খোলা জানালাটার তাকে বসল। এখন স্কুলে সবাই পড়ছে। ওর বন্ধু রাতুল নিশ্চয়ই ভাবছে ওর জ্বর হয়েছে। আন্টিরাও তাই ভাবছে নিশ্চয়ই। ওই যাঃ, অশোক তো ওর কাছে অঙ্কের হোম টাস্কের খাতাটা একদিনের জন্য চেয়েছিল। ও কেন যেন স্কুলে আসতে পারেনি। অঙ্কগুলো টুকে নিত। কি ভাবল অশোক। অশোকেরও বাবা নেই। কবেই মরে গেছে। বাবার কথা ওর নাকি তাই মনেই নেই। তা কি হয় নাকি? এই তো ওর বাবাও মরে গেছেন কই, সব কথা তো এখনও ওর স্পষ্ট মনে আছে। কোন একটা কোম্পানিতে কি যেন কিসের একটা বড় কাজ পেয়েছিলেন বাবা, সব মাল দেওয়া হয়ে গেলেই অনেক টাকা পেতেন বললেন, টাকা পেলেই হীরুকে একটা ছোট্ট দু চাকার সাইকেল কিনে দেবেন। পাড়ার গলিতে চড়া শিখলেই পরে বড় সাইকেল। সে সাইকেল আর কেনাই হল না। আচ্ছা মরে গেলে কি হয়? কোথায় যায় সবাই? মরে গেলে ভূত হয়? ওর বাবা ভূত, কক্‌খনো না। ওর বাবা কত ভাল! সবাই বলে স্বর্গে যায়। সেখানে নিশ্চয়ই খুব ভাল থাকবে। স্বর্গ কোথায়, ওই আকাশে, চন্দ্র সূর্য ছাড়িয়ে আরও আরও দূরে! আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল হীরক। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাত্রিবেলা কত তারা দেখা যাবে। নিশ্চয়ই তার কোনও একটা ওই স্বর্গ হবে।

'খোকা, এটা কি নীলোৎপলবাবুর বাড়ি?' কে যেন রাস্তা থেকে জিজ্ঞাসা করল।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল হীরক, কোট প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ওকে তাকাতে দেখে উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি নীলোৎপলবাবুর বাড়ি?'

ভয়ে ভয়ে হীরক বলল, 'হ্যাঁ।'

'কে আছেন বাড়িতে? একবার ডেকে দাও তো।' বললেন ভদ্রলোক।

'মা আর ছোট বোন ঘুমাচ্ছে।' বলল হীরক।

'নীলোৎপলবাবু তোমার বাবা ছিলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ।' বলল হীরক।

'তোমার মাকে একবার তাহলে ডেকে দাও। বল অবনীকাকা ডাকছেন।'

হীরক তাড়াতাড়ি গিয়ে মাকে ডেকে তুলল। 'মা মা, ওঠ ওঠ, অবনীকাকা এসেছেন। ডাকছেন। কে অবনীকাকা মা?'

মিলুকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে চাদর ঢাকা দিল মা। ক্লান্ত গলায় বলল, 'সে আবার এসেছে কেন? কি চায় রে?'

'কই কিছু তো চায়নি।' বলল হীরক, 'তোমাকে ডাকতে বলল।'

'আয় তো দেখি, কি ব্যাপার।'

ঘরের দরজা খুলে দিতেই অবনীকাকা ভিতরে ঢুকে মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা বলল, 'থাক থাক, ভাল আছ তুমি?,

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'রাধা, খোকা-খুকুরা সব ভাল আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলল অবনীকাকা, 'কালই দুঃসংবাদটা শুনলাম। নানান কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি। এই দেখুন না এখনও কাজ কামাই করে এলাম। কী আর করবেন বলুন, সবই ভাগ্য।' কথার শেষে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতগুলো নোট টেনে বার করল অবনীকাকা। বলল, 'আজই রাতের গাড়িতে আমাকে আবার দিল্লি চলে যেতে হচ্ছে। নইলে দাঁড়িয়ে থেকে দাদার শেষ কাজটা তো আমারই করা উচিত ছিল। এই দুশো টাকা রাখুন। আমারও নানান ঝামেলা চলছে এখন। এর বেশি আর তাই দিতে পারছি না এখন। পরে দেখি ভেবে চিন্তে আর কখনও যদি কিছু দিতে পারি। দাদার জন্য করব না তো করব কার জন্য। আমার যা কিছু সবই তো ও'রই জন্য।' এত কথা বলে টেবিলের বইটার নিচে টাকাগুলো চাপা দিয়ে রাখতে গেলেন কাকা। দেখলেন সেখানে তখনও মামার দেওয়া সেই একশ টাকার নোটটা চাপা দেওয়া আছে। অবাক হয়ে বললেন, 'একি, এখানে যে দেখছি টাকা পড়ে আছে।'

মা বলল, 'টাকা আমার লাগবে না অবনী। ও তুমি নিয়ে যাও। দাদার কথা যে এখনও তোমার মনে আছে এই অনেক। তাও তো কেউ আজকাল মনে রাখে না। আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তুমি আর আমাদের জন্য মিছে চিন্তা কর না। তোমার কত কাজ।'

'না না, টাকাটা রাখুন বৌদি।' বলল অবনীকাকা, 'আপনার এখন তো কাঁচা টাকার দরকার পড়বে।'

'না অবনী, ও টাকা আমি নেব না।' বেশ জোর দিয়ে বলল মা।

হীরক থাকতে না পেরে বলল, 'জেঠিমা কিন্তু বলেছে টাকা দিলে টাকা নিতে মা। না নিলে উনি ভীষণ রাগ করবেন। তুমি টাকা নাও মা।'

কি যে হল কে জানে। যে মা ওর এতক্ষণ একদম কাঁদেনি, একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। কান্নাভরা গলায় বলল, 'অবনী তোমার টাকার আমার দরকার নেই। তুমি যাও। যাও অবনী। আমাকে আর এভাবে অপমান কর না। দাদা তোমার ভাল ছাড়া তো খারাপ করেনি। তবে?'

অবনীকাকা কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে টাকা পকেটে পুরে বললেন, 'আচ্ছা আমি যাচ্ছি তা হলে বৌদি। আমি যা পারি তার বেশি তো আর করতে পারব না। তাতে যদি আপনার মন না ওঠে তো আমি নাচার।' কথার শেষে বাইরে বার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল ওঁকে। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন জেঠিমা। তাঁর মুখে চোখে অবাক চাহনি। পাশে সরে কাকার যাবার পথ করে দিলেন উনি। কাকা চলে যেতেই ঘরে ঢুকে মাকে ধরলেন। বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'বেশ করেছিস ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিস। হ্যাঁরে সন্ধ্যা, তোর আপনজনরা কি সবই এমন নাকি রে? ও তো শুনলাম হিরুর কাকা। কেমন কাকা, দুটো টাকার সম্বন্ধ পাতাতে চায়।'

মা একথার কোন উত্তর দেবার আগেই আবার বললেন, 'চোখ মোছ, চোখ মোছ, ছেলেমেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে এখন তোকে পাথর হতে হবে। বিপদে ভেঙে পড়লে বিপদ বাড়ে জানিস না?'

মাকে নিয়ে জেঠিমা আবার ভিতর ঘরে চলে গেলেন। হীরক দেখল মামার দেওয়া কালকের সেই একশ টাকার নোটটা তখনও বইয়ের তলায় তেমনি চাপা আছে।

আচ্ছা ওর বন্ধুদের সবার তো কাকা, জ্যাঠা, মাসী, পিসী, মামা, মামী আছে। ওদের নেই কেন? যাও আছে তারাও এমন করে মাকে দুঃখ দিচ্ছে কেন? মা কি করেছে? ওর মার মত এত ভাল মা আর কারও হয় না তা তো হীরক জানে। তবে? কে ওকে বলে দেবে কেন সবাই এমন করছে? ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে থামল হীরক। দেখল ওর বাবার কাছে কাজ করে যে ছেলেটা সে আসছে হন হন করে। নিশ্চয়ই ও কোথাও গেছিল, তাই কাঁধে ওর ঝোলা। হিরুকে দরজার কাছে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই ও চেঁচিয়ে উঠল, 'হিরুবাবু দরজা বন্ধ কর না। আমি এসে গিয়েছি।'

হিরুবাবুর বাবার কাজ নমো নমো করে হবে না।

ওকে দেখে হীরকের বেশ ভাল লাগল। ওর নাম রাখাল। ওকে হীরক আর মিলু রাখালদা বলে ডাকে। ও-ও কিন্তু ওদের বাবাকে দাদা বলে ডাকত। মাকে ডাকে বৌদি বলে। বাবা মাকে একদিন বলেছিলেন, 'রাখাল ছেলেটা ভাল। পৃথিবীতে অনেককেই তো বিশ্বাস করে ঠকলাম। রাখাল কখনও তেমন কিছু করবে না।'

কাছে এসেই রাখাল বলল, 'চল হিরুবাবু ঘরে চল। মিলু দিদিমণি কই। বৌদিকে দেখছিনা যে?'

ঘরে ঢুকে হীরক বলল, 'ওরা সবাই ওঘরে। রাখালদা, তুমি কোথা থেকে আসছ?'

রাখাল একগাল হেসে বলল, 'বারে, তাও জান না বুঝি? আমি তো মুর্শিদাবাদে গেছিলাম কোম্পানির মাল সাপ্লাই দিতে। ভারী সুন্দর জায়গা, অনেক গপ্প বলব রাতে। এখন চল, ওঘরে যাই।' ওঘরে তখন জেঠিমা বলছিলেন, 'মান অপমানের কথা এখন রাখ সন্ধ্যা। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে তাদের পত্র দে। দেখ তারা কে কি করে। কিছু না হলেও তো নমো নমো করে পরলোকের কাজটা করতে হবে।'

ওদের কথার মাঝে রাখাল বলল, 'না, না গো ঠাকরেণ। হিরু-বাবুর বাবার কাজ নমো নমো করে হবে না। দানসাগর না হোক ভাল করেই হবে। দশজন বামুন খাবে। আর পাড়াপ্রতিবেশী যাঁরা আসবেন মিষ্টি মুখ করে যাবেন। সে ব্যবস্থাই আমি করব। আমি এসে গেছি না।'

ওর কথা শুনে ভীষণ রাগে জেঠিমা বললেন, 'এ ছেলেটা কে রে সন্ধ্যা? তোদের আত্মীয়-স্বজন বলে তো মনে হয় না। তাদের তো দেখলাম।'

মা কিছু বলার আগেই রাখাল মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'বৌদি, আজ থেকে আমিও তোমাদের বাড়িতে থাকব। হিরুবাবু হব্বিস্যি করছে তো আমিও করব। নিলুদা তো আমার পর ছিল না। কোন কথা শুনব না। জান তো, আমার আবার বাঙ্গালের গোঁ। নিলুদাও আমাকে ভয় করত। হ্যাঁ।'

জেঠিমা বললেন, 'শোন কথা, এরা কোথায় আতান্তরে পড়েছে, আর উনি আপনজন এলেন হব্বিস্যি করতে। তা হব্বিস্যির অন্নটা জুটবে কোথা থেকে শুনি? হ্যাঁরে সন্ধ্যা এ আবার তোদের কেমনধারা আপনজন রে?'

হীরক হেসে বলল, 'ও তো রাখালদা, বাবার কোম্পানিতে কাজ করে। কোথায় গেছিল, আজ ফিরল।'

রাখাল একথা শুনে হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না, না, পরশু ফিরেছি। কাল নিলুদাকে আমিই তো হাসপাতালে নিয়ে যাই। আমিই তো সবাইকে খবর দি। তা পাড়ার কজন বড় বড় মাথা এসে গেল বলে আমি ফের কোম্পানির ঘরে ফিরে যাই। সেখানে তো সব খোলা পড়েছিল। আজও সকালে খাওয়া দাওয়া করে কোম্পানির ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি কী সব্বোনাশ, নতুন ডবল তালা পড়ে গেছে কড়ায়। বাড়ির দারোয়ান বলল, আগে আইন-আদালত হবে, তবে ঠিক হবে কে মালিক, তবে ফের কোম্পানির দরজা খোলা হবে। বাড়িওয়ালার হুকুম তাই তালা পড়েছে। আমি বাড়ির মালিকের হাতে পায়ে ধরলাম, বললাম, একবার এক মিনিটের জন্য দরজা খুলে দাও, একটা ফাইল বার করে নেব। তাতে অন্তত তিন হাজার টাকার পাকা বিল আছে। গেলেই পেমেন্ট পাওয়া যাবে। এখন টাকার কত দরকার। তা শুনে ছোটলোকটা কি বলে জান? বলে টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়া অত সহজ নয়। আরে, আমি কি টাকা মেরে দেবার তালে ছিলাম নাকি? শোন কথা!'

মা বলল, 'রাখাল, এখন তুমি দেশে মার কাছে চলে যাও। আমাদের তো এই অবস্থা। ওদিকে কোম্পানিও যে কবে খুলবে কে জানে। আর খুলবেই বা কি করে? তবে? তুমি কেন মিছিমিছি আমাদের সঙ্গে কষ্ট করবে?'

একথা শুনেই রাখাল চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজে কথা বলবে না তো বৌদি। তোমাদের এই বিপদ, আর আমি মার কাছে গিয়ে বসে গাণ্ডে পিণ্ডে গিলব? না খেতে দাও না-ই দেবে।বয়ে গেল. পাড়ায় কি আর হোটেল নেই? এখানে কত কাজ। আমি যাব না।'

জেঠিমা বললেন, 'না যাও তো না যাবে। তা দশ জন বামুন ভোজ দিয়ে নিলুর কাজটা হবে কী করে শুনি? ফুস মন্তরে না কি?'

একথা শুনে রাখাল হাসল। কোন কথা আর না বলে কোমরে গোঁজা একটা থলি টান মেরে বার করে সেটা শূন্যে তুলে বলল, 'এটাই আমার ব্যাঙ্ক, বিলিতি ব্যাঙ্ক। ঝাড়লেই টাকা পাব। সাত আটশ টাকা আছে এখানে। সব আমার মেহনতের টাকা। চোর-চোট্টার কারবারে আমি নেই। বলুন, এ দিয়ে বামুন ভোজ দিয়ে কাজ করা যাবে কি না।'

ওর কথা শুনে জেঠিমা থমকে গেলেন। মা বলল, 'রাখাল, তোমার টাকা নিয়ে তুমি দেশেই চলে যাও। কত মেহনত করে টাকা রোজগার করেছ। ও টাকা তুমি তোমার মার হাতে তুলে দাও গিয়ে।'

'দূর দূর।' রাখাল বলল, 'মেলা বাজে বোকনা তো বৌদি। আমি এখন কোথাও যাব না। হব্বিস্যি খেতে দাও চাঁদপানা মুখ করে যাব। তা না হলে হোটেলে খেয়ে এখানেই পড়ে থাকব। দেখি কেমন করে তোমরা তাড়াও আমাকে।'

জেঠিমা বললেন, 'তোমার টাকা এরা নেবে কেন?'

একথা শুনে থতমত খেয়ে গেল রাখাল। তারপর বেশ রাগ করেই বলল, 'নেবে তো নেবে, না নেবে তো না নেবে, তা আপনি তাতে বল্লার কে শুনি?'

হীরক বলল, 'উনি তো জেঠিমা।'

'কার জেঠিমা? কোনখানের জেঠিমা? নিলুদার দাদা তো বিয়েই করেননি। থাকেন সেই কোথায় কোন পাহাড়ী মুল্লুকে। তবে?'

'আরে, উনি তো আমাদের এখানকার জেঠিমা', বলল হীরক।

'ও তাই বল!' একটু নড়ে চড়ে বসে বলল রাখাল, 'ও টাকাতো নিলুদাই আমাকে দিয়েছেন। তবে কেন নেবে না?'

মা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। বলল, 'রাখাল, তুমি এখানে থাকবে কোথায়? আর তোমার বাবা মা বেঁচে আছেন, তুমি হব্বিস্যি করবে কেন? টাকা থাক তোমার কাছে। দরকার পড়লে দিও। নেব।'

মহা খুশি হয়ে রাখাল বলল, 'এই তো কথা। চল হিরুবাবু আমরা এখন ছাদে হাওয়া খেতে যাই, মিলু দিদিমণি উঠলে তাকেও পাঠিয়ে দিও বউদি। কী সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকবে ওরা।'

জেঠিমা বললেন, 'হ্যাঁ তা যাও। এতো ভাল কথা। কিন্তু বাপু এ অবস্থায় ওদের আবার বাইরে নিয়ে যেও না। তোমার যা আক্কেল।'

এ কথায় রাখাল একটুও রাগ করল না। বলল, 'পাগল? এখন আমি ওদের রাস্তায় নিয়ে যাই। বেশ বৌদি, আমি নয় হব্বিস্যি করব না। তবে রাতে এখন কদিন তোমাদের বাইরের ঘরে শুয়ে থাকব। খাওয়া দাওয়া হোটেলে। ওতে তুমি না করবে না।'

হীরক জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমি ছাদে যাব জেঠিমা?'

জেঠিমা বললেন, 'যাও। মিলু ঘুম থেকে উঠলে তাকেও এসে নিয়ে যেও। আমি ততক্ষণ তোর মার সঙ্গে দুটো কথা বলি। দেখি তোমাদের অবনী কাকার মত আর কজন আপনজন আছে।'

কথার শেষে উনি দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে সন্ধ্যা, তোদের ব্যাপার কি বলতো? সত্যিই তো এতদিন এ পাড়ায় আছিস, কই কখনও তো তোদের কোন আপনজনদের দেখিনি। ব্যাপার কি রে?'

রাখাল ঘরের দরজা খুলে হীরকের হাত ধরে বলল, 'এস হিরুবাবু, ওসব কথায় আমাদের থাকতে নেই। আমরা ছাদে যাই। দেখবে এস কত ঘুড়ি উড়ছে। বিশ্বকর্মা পুজো কবে ?'

দোতলার সিঁড়িটাই ছাদে উঠে গেছে। বাড়ির মাঝখানে সে সিঁড়ি। দোতলায় থাকেন হরিহরবাবু। অনেক বয়স তাঁর। সব সময়ে ঠাণ্ডা লাগার ভয় বলে বেশ গা হাত পা মুড়ি দিয়ে থাকেন উনি। গরমের সময় শুধু মাথায় টুপিটা পরেন না। মহা পণ্ডিত উনি। ঘর ভরা ও'র অনেক বই। এক ছেলে থাকে তাঁর আমেরিকা, অন্যজন দিল্লিতে খুব বড় চাকরি করেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তাঁরা থাকেন শ্যামবাজারে। মাঝে মাঝে তাঁরাই এসে কদিন থেকে যান এখানে। ও'র নাতি টুলুর বয়স হীরকের মতই হবে। দুজনে খুব ভাব। আর তাই হরিহরবাবু, হীরককেও নাতি বলে ডাকেন। ভাল মানুষ মধুদা হরিহরবাবুর সব কাজ করে দেয়। মধুদা ঘুমোতে ভীষণ ভালবাসে।

দুপুরবেলা নিশ্চয়ই হরিহরদাদুও এখন তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই দুজনে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দোতলার দরজার কাছে পৌঁছতেই দেখল হীরক, হরিদাদু তাঁর ইজিচেয়ারে একটা বই নিয়ে বসে আছেন। দরজায় ওদের ছায়া পড়তেই বই সরিয়ে বললেন, 'কে ওখানে ?'

হীরক আর রাখালকে দেখে বই নামিয়ে বললেন, 'ওঃ তোমরা।'

এর উত্তরে কিছু বলবে কিনা ভাবছিল হীরক। কিছু ভাবার আগেই হরিদাদু বললেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা দাদু। আমি খুব দুঃখিত মাকে বলবে। তবে হ্যাঁ, হুঁশিয়ার। বাড়িওয়ালা নিতাই সাহা মানুষ নয়। তোমাদের পিছনে লাগবে। আমি বলে এ বাড়িতে গত ছাব্বিশ বছর আছি। এক মাসও ভাড়ার গোলমাল করিনি। তাতে কি, গত চার বছর কোর্টে মামলা চলছে ; আমাকে সে উচ্ছেদ করতে চায়। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। নিলু তো শুনেছি কোম্পানিতে কোম্প নিতে মাল সাপ্লাই দিত। তা ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে জমা ? দেখ ও আবার না কোর্ট কাছারিতেই খরচ হয়। ভেরি ব্যাড। আমি খুব দুঃখিত। মাকে সাবধানে থাকতে বলবে। দরকার পড়লে আমাকে ডাকবে। ছাদে যাচ্ছ ? যাও। দেখো ঝুঁকো না যেন। মহাগুরু নিপাত, এখন সাবধানে থাকতে হয়।'

ছাদের আধা সিঁড়ি উঠে রাখাল ফিস ফিস করে বলল, 'ভেরি ব্যাড। হরিখুড়োর মাথায় ছিট আছে। দেড় হাত লম্বা, এ পাড়ার সবার একখানা করে জামা হয়ে যাবে তাতে। ভেরি ব্যাড।'

ছাদে সিঁড়িঘরের ছায়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। রাখাল বলল, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে হিরুবাবু। তাই তোমাকে এখানে ডেকে আনলাম। তোমাদের সব কথা না, আমি জানি। হ্যাঁ, নিলুদা আমাকে সব বলেছেন। বলেছিলেন কোম্পানিতে পার্টনার করে নেবে। মানে অংশীদার, বুঝলে ? বুঝলে না তো ? মানে আমিও নিলুদা আর তোমার মত কোম্পানীর মালিক হয়ে যেতাম। বুঝলে ? তা আর হল না। যাক সে কথা। আমি তোমাদের সব জানি। এখন তাই বলছি, তোমাদের কেউ নেই। না মামা, না কাকা, জ্যাঠা। বৌদিকে বলবে, আমাকে যেন তাড়িয়ে না দেয়। আমি ছাড়া আর তোমাদের কেউ নেই এখন।'

অবাক হীরক বলল, 'কি সব বলছ, কিছু বুঝলাম না।'

'তোমরা গুপ্ত, বদ্যি। তোমার মা মামারা মুকুজ্যে বামুন। বামুনরা বদ্যিদের চেয়ে অনেক জাতে উঁচু। তোমার বাবা মার বিয়েতে তাই মামাদের মাথা হেঁট। তারা আর কেউ তাই আসেন না। ইদিকে নিলুদার দাদা, তোমার জ্যাঠা, তাঁকে তো তোমরা দেখইনি। তিনি নাকি নিলুদার বিয়ের ঠিক করেছিলেন,তা নিলুদা সেখানে বিয়ে করলেন না দেখে রাগে দুঃখে তিনিও সোজা জঙ্গল পাহাড়ের দেশে চলে গেলেন। তিনি বেজায় বড়লোক, তাঁর অনেক টাকা। তবে নাকি ভীষণ রাগী লোক। নিলুদা তাই কতবার চিঠি লিখি লিখি করে ভয়ে লেখেননি। তাঁর ঠিকানা আমার লেখা আছে। এবারে তুমি একটা চিঠি লিখবে তাঁর কাছে। বুঝলে।'

হীরক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আর ওই অবনীকাকা, সে কে ?'

'ইস্, তার নাম করলে ?' জিভ কেটে বলল রাখাল, 'তার নাম মুখেও আনবে না। সে নিলুদার আপন মাসতুতো ভাই। একদম লেখাপড়া শেখেনি। আমার মত মুখ্যু। তবে আমি ভাল ভদ্দর লোক, সে পাজি। নিলুদা তো প্রথমে গুপ্ত চৌধুরী কোম্পানি খুলেছিল। নিলুদা গুপ্ত আর ও চৌধুরী নিলুদা অনেক খেটে যখন কোম্পানী দাঁড় করালেন তখন তোমার ওইপাজি কাকা দু নম্বরী ব্যবসা শুরু করল। ভাল মানুষ নিলুদাকে ঠকিয়ে সব টাকা নিজের নামে ব্যাঙ্কে ভরল। তারপর একদিন মামলা করে গুপ্ত চৌধুরী কোম্পানী থেকে নিলুদাকে তাড়াল। তখন তো আমি ছিলাম না, থাকলে ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে জেলে যেতাম। ও পাজির কথা মুখেও আনবে না! এসেছিল নাকি ও ?'

'হ্যাঁ এসেছিলেন।' বলল হীরক, 'দুশো টাকা দিচ্ছিলেন। মা নেয়নি।'

'কেমন দেখতে লোকটা ? বাঁদরের মত, নাকি ছুঁচোর মত ?' জিজ্ঞাসা করল রাখাল।

হীরক জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জেঠুকে তুমি দেখেছ রাখালদা ?'

'না তো। আমি তখন কই। নিলুদাকেই তখন আমি চিনি না।'

'তবে যে বললে আমাকে চিঠি লিখতে ?'

একথা শুনে একটু কি যেন ভাবল রাখাল। বলল, 'নিলুদা কিন্তু দাদার কথা খুব বলতেন বুঝলে হিরুবাবু, তোমার জেঠু নিশ্চয়ই লোক খুব ভাল। তা না হলে কেন নিলুদা বারবার তার কথা বলতেন? কই ওই অবনী ছুঁচো বা তোমার মামা বাড়ির কথা তো কখনও বলতেন না। তাই বলছিলাম, এমন বিপদে তাঁকেই তোমার চিঠি লেখা উচিত।'

একথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল হীরক। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের কী বিপদ গো রাখালদা ?'

রাখালের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, 'এস ছাদের পাঁচিলে হাত রেখে দাঁড়াই। অনেক কথা আছে, সব তোমাকে বলব। এখন নিলুদা নেই তোমাকেই তো সব করতে হবে। বিপদের কথা তোমার না জানলে চলবে কেন ?'

ছাদের পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। রাখাল বলল, 'ঝুঁকো না কিন্তু খবরদার। জান না পৃথিবীটা ভীষণ খারাপ জায়গা। এত খারাপ, ধারণাও করা যায় না। আর এখানে টাকা না হলে কিছু করা যায় না। নিলুদা কোম্পানির কাজ করে মাসে মাসে টাকা আনত, তা দিয়ে চাল ডাল নুন তেল কেনা হত তবে তোমরা খেতে পেতে। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হত, তবেই বাড়িতে থাকতে পেতে তোমার আর মিলু দিদিমণির স্কুলের বেতন দেওয়া হত তবেই না পড়াশোনা করতে পারতে। এখন তো নিলুদা নেই, মাস মাস টাকা আসবে না, এসব চলবে কি করে ?'

হীরক কী বুঝল কে জানে। ভীষণ ভয়ে ওর দুচোখ বড় বড় হয়ে গেল। ও যে কি বলবে তা ভেবে পেল না।

রাখাল বলল, 'তারপর বাড়িতে কেউ মরলে হবিষ্যি করতে হয়, ছেরাদ্দ করতে হয়, বামুন খাওয়াতে হয়। তাতেও এককাঁড়ি টাকা লাগে। সে টাকা দেবে কে ? মামা তোমাদের আসবে না, বোঝো, একবার যদি আসে তবে তো তাঁকে মাস মাস সব খরচ দিতে হবে। সে দায় তিনি নেবেন কেন ? আর চোর অবনীকাকা তো চোরই, সে এলে তোমাদের ঘটিবাটি যা আছে তাও হয়ত চুরি করে নিয়ে যাবে। খরচের টাকা দিতে তার বয়ে গেছে।'

ভীষণ ভয়েই হীরক জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমাদের কী হবে

রাখালদা ?'

'এখুনি কিচ্ছু হবে না', বলল রাখাল, 'সাত আটশ টাকা আছে আমার থলিতে। মাস মাস মাইনার জমান টাকা। তা দিয়ে কিছুদিন চলবে এখন। কিন্তু তারপর ? আমি উকিলবাবুর কাছে যাব। কোম্পানিটা খোলাবার চেষ্টা করব। যদি আমি কোম্পানি চালাতে পারি তবে মাসে মাসে কিছু আসবে। তবে মুস্কিল কী জান, আমি গতরে খাটতে পারি, লেখাপড়া তো জানি না। লেখাপড়া না জানলে কি কোম্পানি চলে ? তাই বলছিলাম, জেঠুকে তুমি একটা চিঠি লেখ। তিনি এসে পড়লে সব গোলমাল মিটে যাবে।'

কথার শেষে ঝোলা থেকে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার ফর্ম বার করল রাখাল, বার করল একটা কলম। বলল, 'খবরদার, বৌদিকে এই চিঠির কথা এখন বলবে না। তিন চারদিন বাদে একটু সুস্থ হলে তবে বলবে। নাও এখন লেখ চিঠিটা।' ঝোলার মধ্যে থেকে একটা বাঁধান খাতা বার করে তার উপরে চিঠির কাগজটা পেতে দিল রাখাল।

কলম হাতে ধরে হীরক বলল, 'কি লিখব রাখালদা ?'

মাথা চুলকে, অনেক ভেবে রাখাল বলল, 'লেখ, ছিরি চরণে প্রণাম জেঠুমশাই আগে জানবেন আমরা সকলে ভাল আছি। লেখ, লেখ, গোটা গোটা করে লেখ। আমার বাবা ছিরি নিলুদা, না না, নিলোতপল বাবুমশাই গতকাল মারা গেছেন। এখানে আমরা তাই ভীষণ বিপদে আছি। এখানে না খুব দুঃখু করে লেখ, বাড়িওলা ভাড়ার জন্য ঝগড়া করছে। ইসকুল মাইনার জন্য নাম কেটে দেবে বলেছে। বোন মিলু-দিদিমণির খুব জর। ডাক্তার জবাব দিয়েছে।'

হীরক কলম থামিয়ে বলল, 'নাঃ তা লিখব না। বোনের তো কিছুই হয়নি,তবে ?'

রাখাল ভীষণ রাগ করে বলল, 'আহা বোঝ না কেন, জেঠু ছাড়া তোমাদের এখন আর কেউ নেই। খুব দুঃখু দুঃখু করে না লিখলে তিনি আসবেন কেন ? ওসব লিখতে হয়। ওতে পাপ হয় না।'

চিঠি লেখা শেষ হলে রাখাল বলল, 'বাঃ বেশ হয়েছে চিঠি। নাও এখন উপরে ঠিকানা লেখ। লেখ, নীলমাধব গুপ্ত। ফুলবাড়ি বাগিচা। পোঃ, তোরষা ঘাট। জিলা, দার্জিলিং। পশ্চিম বাঙ্গালা।'

চিঠিটা থুতু দিয়ে আটকে রাখাল বলল, 'এখন এটা আমি ডাকে দিতে চললাম। চল, নিচে চল। খবরদার এখন এসব কথা কাউকে বলবে না। জেঠু এলে তো সবাই জানতেই পারবে। না এলে দু-চার দিন বাদে বলবে।'

দোতলার সিঁড়ির কাছে হরিহরবাবু আবার ওদের ধরলেন, বললেন, 'বুঝলে, অনেক ভেবে দেখলাম সামনে তোমাদের এখন অনেক বিপদ। কাকা, জ্যাঠা, মাসী, পিসী, মামা, মামী এদের সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে তো ? মাকে বলবে তাঁদের ডাকতে। বিপদে তাঁরাই তো দেখবেন। আর হ্যাঁ, দরকার পড়লেই আমাকে ডাকবে। যদি সময় করতে পারি তো যাব। বুঝলে ?'

রাখাল মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ সব বুঝেছি। এখন আমরা যাই ?'

বাইরের রাস্তায় বার হয়েই রাখাল বলল, 'বেশ লোক তো উনি ! কত উপদেশ দিলেন ! কাজের বেলায় নিচে কিন্তু নামবেন না। হিরুবাবু, তোমাকে এখন না খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে। তখন দেখবে এই দুনিয়ায় না কত সব অদ্ভুত লোক বাস করে। এতদিন নিলুদার আড়ালে ছিলে, কিছুই দেখনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারনি। এখন সব দেখে বুঝতে হবে। না যদি পার তো একদম ঠকে যাবে।'

ওর এসব কথার কিছুপ্রায় বুঝল না হীরক। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো বড় হয়েছ রাখালদা, তুমি সব দেখে বুঝতে পার ?'

ওর একথা শুনে কেন যেন বেশ গম্ভীর হয়ে গেল রাখাল। রাখাল তেমনিভাবেই বলল, 'আমরা গরীব চাষাভূষা, আমাদের তাই মা-বাবা থেকেও নেই হিরুবাবু। আমাদের তাই চোখ কান খুলে চলতে হয়, সবকিছুই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হয়।'

হীরক বেশ মজা পেয়ে বলল, 'চোখ কান বুজে মানুষ চলতে পারে বুঝি ? তুমি চলে দেখাও তো ?'

'আছে আছে, এ পৃথিবীতে হাজার চোখ কান বোজা মানুষ আছে হিরুবাবু। তারা দিব্যি গ্যাঁট গ্যাঁট করে চলে বেড়াচ্ছে। তবে আর বলছি কী তোমাকে। নাও ঘরে গিয়ে দোর দাও। আমি পোস্ট আপিস হয়ে আসছি এখুনি।'

রাখাল হন হন করে হাঁটা দিল বড় রাস্তার দিকে। হীরক চোখ কান বোজা মানুষগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেদের বাড়ির কড়া ধরে নাড়া দিল। ধাক্কা দিতে হল না, দরজাটা আপনিই খুলে গেল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জেঠিমা, তার পাশে মিলু, ও একটা সাদা ফ্রক পরেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মা।

ওকে দেখে মিলু বলল, 'বারে চলে এলে যে ? আমি ছাদে যাব না ?'

হীরক বলল, 'রাখালদা তো পোস্ট আপিসে গেল। আমি তাই চলে এলাম।' বলেই ও বুঝল খুব ভুল করে ফেলেছে ও। পোস্ট আপিসের কথাটা না বললেই হত।

মিলু আবদার ধরে বলল, 'না, না আমিও ছাদে যাব। এখুনি যাব। তুমি চল দাদা।'

জেঠিমা বললেন, 'যা যা বাবা, ওকে একটু খোলামেলায় ছাদে নিয়ে যা। সারাদিন ঘরে বন্দী থাকা কি ভাল ?'

মা জিজ্ঞাসা করল, 'রাখাল কি আবার আসবে রে ?'

হীরক একথা শুনে বেশ বোকা বনে গেল, 'ওই যাঃ, সে কথা তো ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি !'

জেঠিমা বললেন, 'ছেলেটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, তা বাপু ওর মনে দয়ামায়া আছে। ও যদি রাতে থাকতে চায় তো এখন না করিস না সন্ধ্যা।'

মা বললেন, 'ছেলেটা থাকবে, ওকে খেতে দেব কি ? আর মাস গেলে মাইনা ? না দিদি সে ক্ষমতা আর আমার নেই।'

মিলু ওদের কথার মাঝেই ফের আবদার ধরল, 'চল না দাদা ছাদে। আমি ঘুড়ি ওড়ান দেখব।'

মা বলল, 'যা বোনকে নিয়ে যা বাবা। দেখিস ঝুঁকিস না যেন।'

জেঠিমা বললেন, 'ও যদি নিজে থাকতে চায়, তবে যেন তুই আবার না করিস না। আমি চলিরে এখন। কাল বিকেলে কত্তা আসবেন বামুনকে সঙ্গে নিয়ে। যা হোক কিছু তো একটা করতে হবে। তা তোর যা ক্ষমতা তাই করবি। তাতে যে যা বলে বলুক।

জেঠিমার পিছন পিছন ওরা দুজনে রাস্তায় বার হয়ে এল। জেঠিমা বললেন,'আমি এখানে দাঁড়ালাম। যা তোরা দুটিতে ছাদের সিঁড়ি ধর গিয়ে। আমি দেখে যাই।'

ধুপধাপ করে দু চারটে সিঁড়ি উঠেই মিলু থামল। বড় বড় চোখ করে বলল, 'না দাদা ছাদে যাব না। নিচে চল, আমার ভয় করছে।'

অবাক হীরক বলল, 'ভয় করছে, কিসের ভয় ?'

'ভূতের, ছাদে ভূত আছে।'

যেন একটুও ভয় পায়নি এমন ভাব করে হীরক বলল, 'যাঃ !'

'হ্যাঁরে আছে। অনেক ভূত, বাবাও আছে রে।'

একধাপ সিঁড়ি নেমে হীরক ফের বলল, 'যাঃ।'

বেশ গম্ভীরভাবে মিলু বলল, 'পুনুর মা, মাকে বলছিল, বাবা নাকি জলের জন্য ছটফট করছে। রোজ রাতে পিদিম জেলে এক গেলাস জল ঢাকা দিয়ে রাখতে। তবে ?'

বেশ সাহস করে হীরক বলল, 'বাবা আমাদের কিছু বলবেন না। আমাদের তো খুব ভালবাসতেন। তবে ?'

'যাবি, তাহলে দাদা ?'

'চল।'

দোতলার দরজার কাছে পৌঁছাতেই হরিহরবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফের এলে যে তোমরা ? তা ভালই করেছ। আমি তখন থেকে ভাবছি, বাড়িতে তো এখন তোমার মা আর তোমরা। তা কাজ-কর্ম, খরচ-খরচা, -এসব দেখবে কে ? পাড়া প্রতিবেশীরা ? তাদের চেনা আছে। ওঃ, তোমরা দুজনে তো আবার বেজায় ছোট, তোমাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা না করা সমান। মাকে বলবে দরকার পড়লেই যেন বলে। সময় সুবিধা হলে যেতে পারি। বুঝলে ?'

ভয়ে ভয়ে আবার মাথা নাড়ল হীরক।

হরিহরবাবু বললেন, 'যাও যাও, ছাদে যাও। ঝুঁকো না যেন।'

ছাদে উঠে মিলু জিজ্ঞাসা করল, 'দাদু কি বলল রে দাদা ?'

'অনেক কথা বলল।'

'কেন বলল রে ?'

'সে তুই বড় হলে বুঝবি।'

একথা শুনে মিলু বলল, 'আমি বড় হব, তুই বড় হবি। তাহলে না,মা আর কাঁদবে না। হ্যাঁ, মা বলেছে, তার জন্যই তো মা বেঁচে আছে। তা নাহলে মাও মরে যেত রে।'

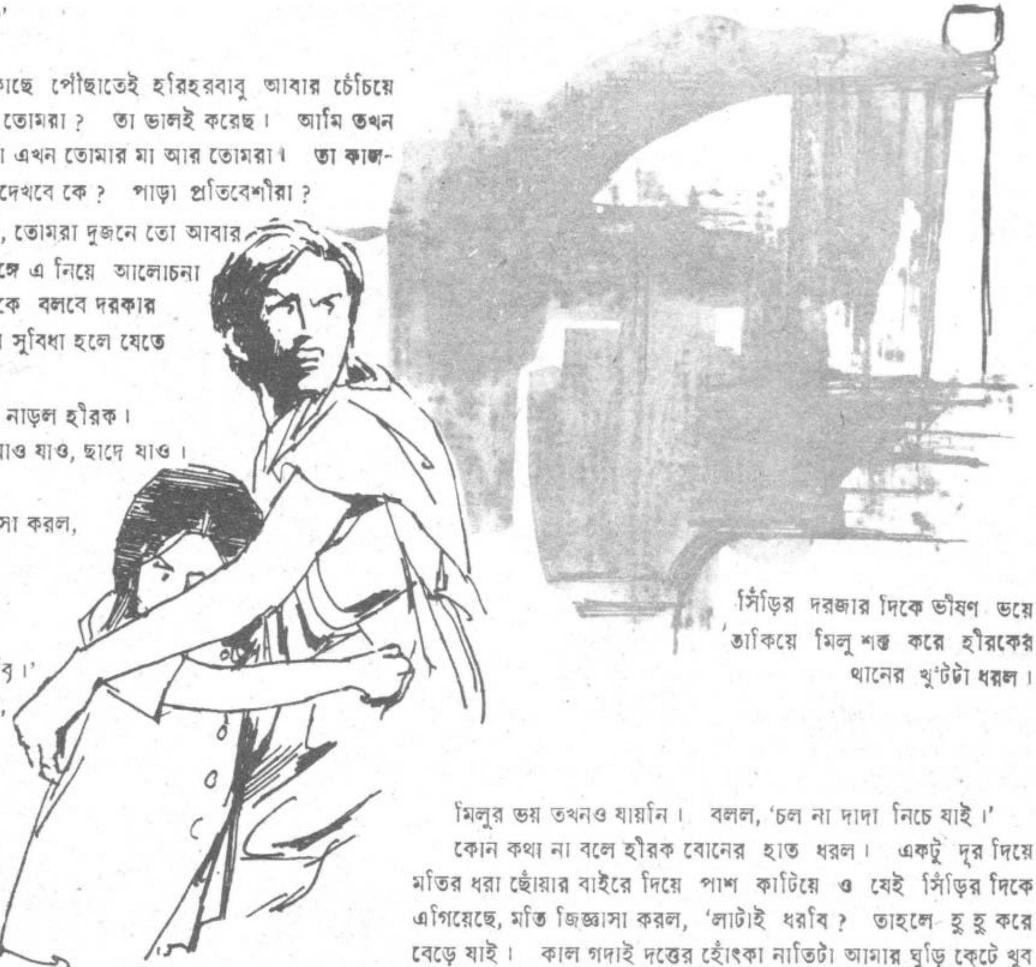

সিঁড়ির দরজার দিকে ভীষণ ভয়ে তাকিয়ে মিলু শক্ত করে হীরকের থানের খুঁটটা ধরল।

'ওসব বলতে নেই', বলল হীরক, 'তুই জানিস না, আমাদের খুব বিপদ। এখন আমাদের চোখ কান খুলে চলতে হবে। এসব একদম সত্যি কথা।'

মিলু বলল, 'আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। কিচ্ছু না, কেন যে বাবা মরে গেলেন।'

হীরক বলল, 'আমারও একদম ভাল লাগে না। খালি কান্না পায়। বাবা কত ভাল ছিলেন। কত ভালবাসতেন।তবু বলছি খবরদার এক-দম কাঁদবি না। মার কাছে খুব হাসবি। তা হলেই মারও হাসি পাবে। ব্যস, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বাবা ফিরে আসবেন ?

হীরক বলল, 'যাঃ, তা কি কখনও হয় ?'

তখনই সিঁড়িতে ধুপ ধাপ আওয়াজ উঠল। সিঁড়ির দরজার দিকে ভীষণ ভয়ে তাকিয়ে মিলু শক্ত করে হীরকের থানের খুঁটটা ধরল। বলল, 'ও কিরে দাদা ?'

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছিল হীরকের। কাঁপা গলায় বলল, 'কেউ আসছে।'

কেউ যে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু কেন যে হীরকের ভীষণ ভয় হল তা হীরক বুঝতেই পারল না। চোখও ফেরাতে পারল না সিঁড়ির দরজার দিক থেকে। যে এল তাকে কখনও দেখবে ভাবেনি হীরক। দরজা দিয়ে বার হয়ে এল মতিদাদা। তার এক হাতে বোমা লাটাই, অন্য হাতে একগোছা ঘুড়ি। মতিদাদাকে পাড়ার কেউ ভালবাসে না।

ওদের দুজনকে ছাদে দেখেই চোখ বড় বড় করে মতি বলল, 'এই এখানে কি করছিস ? ভাগ ভাগ এখান থেকে। ভাগলি ?'

মিলুর ভয় তখনও যায়নি। বলল, 'চল না দাদা নিচে যাই।'

কোন কথা না বলে হীরক বোনের হাত ধরল। একটু দূর দিয়ে মতির ধরা ছোঁয়ার বাইরে দিয়ে পাশ কাটিয়ে ও যেই সিঁড়ির দিকে এগিয়েছে, মতি জিজ্ঞাসা করল, 'লাটাই ধরবি ? তাহলে হু হু করে বেড়ে যাই। কাল গদাই দত্তের হোঁৎকা নাতিটা আমার ঘুড়ি কেটে খুব প্যাক দিয়েছে। ও তো ওদের জন্মের মধ্যে একটা কম্মো। আমার কিন্তু রাগে গা রি রি করছে। আজ শোধ তুলব। ধর ধর, লাটাইটা ধর।'

কথার শেষে হাতের লাটাইটা হীরকের হাতে জোর করেই গুঁজে দিল।

মিলু তা দেখে ফের ভয়ে ভয়ে বলল, 'নিচে যাবি না দাদা ?'

মতি ঘুড়ির কলকাট্টি লাগাতে লাগাতে বলল, 'যাবে যাবে, দেখ না কেমন ঘুড়ি ওড়াই। ঘুড়ি কাটলে খুব দুয়ো দিবি চেঁচিয়ে। বুঝলি।'

ফর ফর করে ঘুড়িটা হাওয়ায় উড়ে চলল। হীরকের হাতে লাটাইটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। বহুদিন ধরে ঘুড়ি ওড়াবার শখ হীরকের, তবে স্কুল থেকে ফিরতেই বেলা শেষ হয়। তাই আর ঘুড়ি ওড়ান ওর হয়নি। আকাশে তাকিয়ে দেখল ও সারা আকাশ ছেয়ে অনেক ঘুড়ি উড়ছে। তার মধ্যে মতিদার ঘুড়িটা খালি পাক খাচ্ছে।

মতি বলল, 'ওই যে লাল ঘয়লাটা উড়ছে, ওটাই দত্তবাড়ির হোঁৎকা নাতির। আমি গোঁত্তা খেয়ে ওর ঘাড়ে পড়ছি। লাটা মাঞ্জা, সুতো ছাড়বি। বুঝলি ? সঙ্গে চেঁচাবি।'

ঘয়লা ঘুড়িটা কিছুতেই কাছে আসবে না। অনেক কসরৎ করে মতিও পঙ্খিরাজটা ঘয়লার কাছে এনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সুতোয় লম্বা লম্বা টান দিয়ে গোঁত্তা খাইয়ে নিজের ঘুড়িটা এনে ফেলল ঘয়লার ঘাড়ে। এক মিনিট দম ধরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এই বুদ্ধু সুতো ছাড়, সুতো ছাড়। ছাড়লি।'

সারা ছাদ জুড়ে সুতো ছড়িয়ে দিল। তাই হীরক লাটাইটা শক্ত করে ধরে ছিল। কিসে কি হল কে জানে, ছড়ান সুতোগুলো সব হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে লাটাইয়ে টান পড়ল। ও লাটাই আলগা করার আগেই

ওদের পক্ষিরাজ ভো-কাট্টা হয়ে গেল। আকাশের সুতো হঠাৎ ঢিলে হয়ে পড়তে লাগল। দূরে আর একটা বাড়ির ছাদে অনেক গলার চিৎকার উঠল, 'ভো-কাট্টা, ভো-ও-ও-ও কাট্টা।'

হীরকের হাত থেকে লাটাই কেড়ে নিয়ে ভীষণ জোরে সুতো গোটাতে লাগল মতি। সুতো গোটান হতেই লাটাই নামিয়ে রেখে রুখে দাঁড়াল হীরকের সামনে, 'সুতো ছাড়তে বললাম, কথা কানে গেল না? গাধা কোথাকার।' বলেই ঠাস করে হীরকের গালে এক চড় কষিয়ে দিল।

আচমকা চড় খেয়ে চোখ ফেটে জল এল হীরকের।

মিলু চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি মারলে যে আমার দাদাকে?'

মতি বলল, 'বেশ করেছি। সুতো ছাড়তে বললাম, গাধাটা লাটাই শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।'

'মাকে বলে দেব।' ভীষণ রাগে বলল মিলু।

'যা যা বলগে যা।' মুখ ভেংচে বলল মতি। বলেই তাকিয়ে দেখল সিঁড়ির দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রাখাল।

রাখালকে দেখেই মিলু কেঁদে ফেলে বলল, 'এই ছেলেটা দাদাকে মিছিমিছি মেরেছে। তুমিও ওকে মারতো রাখালদা।'

মতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার বলছি গায়ে হাত তুলবে না। তাহলে ভাল হবে না বলে দিলাম।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই ওর দামী বড় লাটাইটা বাড়ির পাশের বন্ধ গলিটার মধ্যে দড়াম করে পড়ল। ঘুড়ির গাদাটা তুলে নিয়ে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিল রাখাল। তারপর দু হাত ঝেড়ে বলল, 'যাঃ, গায়ে আর তোর হাত তুললাম না।'

মতি হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কান্নাভরা গলায় বলল, 'আমার লাটাই ভাঙলে যে, আমার ঘুড়ি ফেলে দিলে যে? আমি কি করেছি তোমার?'

রাখাল বলল, 'হিরুবাবু, মিলুদিদিমণি নিচে চল, বৌদি ডাকছেন। ধেড়ে খোকা এখানে কাঁদুক দাঁড়িয়ে। হিরুবাবুকে মারার সময় মনে ছিল না?'

'ও তো লাটাই শক্ত করে ধরে আমার ঘুড়ি কাটিয়ে দিল।'

'তা বলে তুই এখন ওকে মারবি? ওদের এখন কত কষ্ট জানিস না?'

'আমি তো বুঝতে পারিনি।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে মতি বলল।

রাখালের রাগ পড়ল। বলল, 'বেশ চল তাহলে নিচে, দেখি তোর লাটাইটার কি হাল হল। ভাঙলে নতুন কিনে দেব।'

সবাই ওরা নিচে নামতে লাগল। ছাদে কিছু হচ্ছে তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় হরিবাবু চেয়ার ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখেই বললেন, 'কে কাঁদল যেন মনে হল? কী ব্যাপার শুনি? চোটটোট লেগেছে কারুর? এখনি তাহলে ডাক্তার দেখাও।'

'না কারও কিছু হয়নি।' বলল রাখাল।

ওরা রাস্তায় নেমে এল। হীরক দেখল, ওদের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

রাখাল বলল, 'এ গাড়ি কার? কে এল হিরুবাবু?'

মতি বলল, 'ওই তো ঘুড়িগুলো সব পড়ে আছে রাস্তায়। আমি তুলে আনছি। লাটাইটা না ভাঙলেই হল। আমি যাচ্ছি।'

কথার শেষে ও ছুটে চলে গেল ঘুড়িগুলো কুড়োতে।

রাখাল বলল, 'এসো তো দেখি কে এল।'

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখল মা ভিতরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আর একজন মোটা মত ভদ্রলোক মার দিকে মুখ করে কী যেন বলছেন। ওদের পায়ের শব্দ শুনে তিনি ওদের দিকে ফিরে তাকালেন। হীরক দেখল, ওদের বাড়িওয়ালা সাহামশাই দাঁড়িয়ে আছেন।

বাড়ির ভাড়া নিতে দারোয়ান আসে। কিন্তু মাঝে মধ্যে উনি যখন আসেন, বেশ চেঁচামেচি করে গরম গরম কথা বলে যান। একদম ভাল লোক নন সাহামশাই।

সাহামশাই বললেন, 'খুব দুঃখের কথা, খুবই দুঃখের কথা। আহা, ছেলে মেয়েরা মানুষ হল না এরই মধ্যে...তা ভগবানের উপর তো আর হাত নেই কারও। দেখুন, আমি বলছিলাম কি, মাস মাস এখন আড়াইশটা করে টাকা টানা তো আর আপনার পক্ষে সহজ হবে না। তাই বলছিলাম কোনও আপনজনদের কাছে...না হয় তো ভদ্র পাড়ায় কোনও কম ভাড়ার বাড়িতে উঠে যান। আমার সংসার চলে বাড়ি ভাড়ার টাকায়। দিনকাল যা পড়েছে বোঝেন তো দান খয়রাত করার মত অবস্থা আর আমার নেই। ভাড়া দেবেন থাকবেন, তাতে অবশ্য আমার বলার কিছু থাকবে না। কিন্তু অতগুলো টাকা পাবেন কোথায়? আহা, বড়ই দুঃখের কথা। কিই বা এমন বয়স হয়েছিল বলুন? তা সবই ভগবানের হাতে। ওখানে আর ট্যাঁ ফুঁ করতে হবে না। এ মাস পুরো থাকুন। তারপর ভেবে দেখবেন। আচ্ছা আজ চলি।' কথার শেষে একটা দায়সারা নমস্কার ঠুকে উনি বার হয়ে গেলেন।

রাখাল ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাজি, ছুঁচো কোথাকার। এসব কথা বলার আর সময় পেল না!'

মা কিছু বলার আগেই রাখাল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কই বৌদি সব রেডি করেছেন? এসো এসো, ভিতরের ঘরে চল। একটু ফলটল খেতে হবে তোমাদের। এখন এসব খেতে হয়। বৌদি চা কর, আমি খাব তুমিও খাবে। চা-তে কোন দোষ হয় না। ও আমি জানি।'

এসব কথার কোনও উত্তর দিল না মা। নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে রাখাল বলল, 'হিরুবাবু, তোমার মা সারাদিন এত কি ভাবছে বল তো? এত ভাবতে না করবে।'

ছানা আর ফল খেল হীরক আর মিলু। রাখাল খেল চা। মাও ওর পীড়াপীড়িতে একটু চা খেল। মা বলল, 'রাখাল তুমি কেন এত টাকা খরচ করে ফল ছানা আনতে গেলে? বলেছি তো দরকার পড়লে তোমার কাছ থেকে টাকা আমি নেব।'

রাখাল বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটু ফল ছানা কিনলে আমি ভিকিরি হয়ে যাব না। আমি এখন উকিলবাবুর কাছে যাচ্ছি। দেখি কোম্পানিটা খোলা যায় কি না। উকিলবাবু রাজি হলে কাগজ-টাগজে সই দিতে হবে কিন্তু বৌদি। তখন যেন আবার না বল না।'

বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রাখাল বলল, 'ওই যাঃ, আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি। বৌদি তোমাদের ঠাকুরমশাইয়ের কথা বল। তাকেও তো খবর দিতে হবে। আমি দিয়ে যাব।'

মা বলল, 'ওবাড়ির দিদি তাঁদের ঠাকুরমশাইকে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আসবেন বিকালে। ওঁরা থাকবেন বলেছেন সামনে।'

খুশি হয়ে রাখাল বলল, 'তবে তো কোন ঝামেলাই রইল না।' কথার শেষে বড় বড় পা ফেলে ও গলির মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল হীরক ঘুড়ি লাটাই হাতে নিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে মতি। ওকে দেখে ও এগিয়ে এসে বলল, 'তখন তোর খুব লেগেছিল, না রে খোকা?'

লজ্জায় হীরক মাথা নাড়ল। পিছন থেকে মিলু বলল, 'আবার তুমি দাদার সঙ্গে কথা বলছ। যাও যাও, তুমি মন্দ।'

মতি বলল, 'আমি তোকে মারব বলে মারিনি রে। তোর বোকামিতে ঘুড়িটা কেটে গেল যেই কেমন যেন রাগ হল...'

মিলু বলল, 'হ্যাঁ, তখন মেরে, এখন ভাব করা হচ্ছে! দাদা তো ছোট্ট। মারতে লজ্জা করল না তোমার? বেশ করেছে রাখালদা তোমার লাটাই ফেলে দিয়েছে। ভেঙে যাক তোমার লাটাই। বেশ হয় তাহলে।'

ফিক করে হেসে মতি বলল, 'ভেঙেছে না ছাই, এই দেখ কেমন আস্ত আছে। আজ দেরী হয়ে গেল। কাল আবার ঘুড়ি ওড়াতে আসব। তখন তোকে ডাকব। লাটাই ধরবি। মারব না বলে দিলাম।'

হীরক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি স্কুলে যাও না মতিদা ?'

কেমন করে যেন ঘাড় ঝাঁকাল মতি। কেমন করে যেন তাকাল। বলল, 'তোর বাবা কাল মরে গেছে। আমার বাবা তো কবেই মরে গেছে। আমি তখন এই এত্তোটুকু। কে ইসকুলের মাইনা দেবে যে আমি ইসকুলে যাব ? আমি তো ঘোষবাবুদের হোটেলের বয়। দুপুরে দুঘণ্টা ছুটি, ঘুড়ি ওড়াই। ব্যস। কাল আসব। রেডি থাকিস।'

মতিও চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মিলু বলল, 'ওরও বাবা নেইরে দাদা। ওরও খুব দুঃখু, ভীষণ বিপদ না রে ?'

হিরু বলল, 'হ্যাঁ।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা এল মার কাছে। বাবার খাটের কাছে মেঝেতে মা বসে আছে খাটে হাত রেখে। মিলু গিয়ে মার কোলে চড়ে বসল। হীরক বসল পাশে। খাট থেকে হাত তুলে দুজনকেই বুকের কাছে টেনে নিল মা। বুক ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হীরক মুখ তুলে মার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বলল, 'আমাদের খুব বিপদ, না মা ?'

মিলু বলল, 'হ্যাঁ, রাখালদা বলছিল। বিপদ কী মা ?'

কী যে হল ওরা দুজনেই বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে দেখল ওরা মা ওদের ফুলে ফুলে কাঁদছে। এমন কান্না তো কখনও মা কাঁদেনি।

ভীষণ ভয় পেয়ে মিলু বলল, 'কাঁদে না মা, কাঁদে না।'

হীরক তাড়াতাড়ি বলল, 'বিপদ বলে আমি না মা জেঠুকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। রাখালদা বলল তাছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। রাখালদা চিঠি ডাকে দিয়ে দিয়েছে। কেঁদ না মা, জেঠু নিশ্চয়ই আসবে।'

কান্না ভরা গলায় মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী লিখেছিস বাবা ?'

'রাখালদা যা যা বলল তাই লিখেছি। আমাদের খুব বিপদ। বাবা মরে গেছে, এই সব।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলল, 'দ্যাখ, এখন তোর জেঠু আসেন কি না। না এলে যে কী হবে তা আমি বুঝতেই পারছি না।'

হীরক বেশ ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'না যদি আসেন তো কী হবে মা ? আমাদের টাকা পয়সা নেই না ?'

মিলু বেশ চিন্তা করে বলল, 'তাহলে খুব বিপদ হবে, না মা ?'

উত্তরে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা। আস্তে আস্তে হীরকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এক্ষুনি অনেক টাকা লাগবে রে। তোর বাবার শেষ কাজ। তারপরই বাড়িভাড়া দিতে হবে। না দিলে তো বাড়িওয়ালা থাকতেই দেবে না। কোথা থেকে যে কী করব আমি! আমাদের কেউ নেই রে। কেউ নেই।'

মিলু বলল, 'রাখালদা আছে। রাখালদা খুব ভাল। রাখালদা টাকা এনে দেবে মা। তুমি কেঁদ না।'

চোখে জল নিয়েও মা হাসল। বলল, 'সে আর কত টাকা আনবে বল ? আমাদের তো অনেক দরকার। বাবা হিরু তুই বরং ওবাড়ির জেঠুর কাছে যা। বল, জ্যাঠামশাইকে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে। তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসেন। যা বাবা, বলে আয় এখুনি গিয়ে।'

মিলু বলল, 'আমিও যাব মা ?'

হীরক বলল, 'না তুই মার কাছে থাক। মা একা থাকবে না। আমি যাচ্ছি। ঠিকানাটা দাও মা।'

মা উঠল। কাঠের আলমারিটা খুলে কিছু কাগজপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করল। তারপর বেশ চিন্তা নিয়ে বললেন, 'ঠিকানাটা

মিলু বলল, 'আমিও যাব মা ?'

পাচ্ছি না তো। চিঠিপত্র তো লেখালেখি হত না। কোথায় যে রেখেছি ঠিকানাটা!'

হীরক বলল, ও ঠিকানা তো রাখালদার কাছে আছে। রাখালদা এলেই টেলিগ্রাম করব। তা হলেই জেঠু আসবে।'

হীরক বলল, 'জেঠু আসেন না কেন মা ? জেঠু কি বাবার উপরে রাগ করেছিলেন ?'

মা বলল, 'সব ভাগ্যরে। তা না হলে আমাদের এমন হবে কেন ?'

বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। হীরক উঠল দরজা খুলতে। মিলু এল পেছন পেছন। দরজা খুলে দেখে ওবাড়ির

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে একজন বুড়ো মানুষ, তাঁর কাঁধে ভিজে গামছা। জেঠু বললেন, 'মাকে ডাক। বল, ঠাকুরমশাই এসেছেন।'

মা ভিতরবাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কাগজ কলমে অনেক কিছু লেখালেখি অনেক কথার পর ঠাকুরমশাই তাঁর টিকি নেড়ে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল বউমা। কাল বিকালে আমি সব টাকাটা নিয়ে যাব এসে। বিস্যুৎবার সকালে এসে ঘাট কাজ করাব। শুক্কুরবার ছেরাদ্দ। আর শনিবার মৎস্যাস্পর্শ। আহা এতটুকু ছেলের কপাল পুড়ল। কী করবে মা সবই ভাগ্য।' গামছাটা ভাল করে কাঁধে নিয়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন।

ওবাড়ির জ্যাঠামশাই বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল বউমা। তোমার দিদির শরীরটা আজ আবার এখন একটু যেন কেমন কেমন করছে। যত বলি সময়ে খাবে সময়ে শোবে। কে শোনে কার কথা। আমি থাকব দাঁড়িয়ে কাজের দিন। কিছু ভেব না। চলি।'

ওরা চলে যেতেই হীরক বলল, 'অত টাকা তুমি কোথায় পাবে মা? অত টাকা তো তোমার নেই।'

মা যেন কেমন হয়ে গেছে মনে হল হীরকের। কি যেন ভাবছে। বলল, 'রাখাল কখন আসবে বলেছে রে? ও ফের আসবে তো?'

মিলু বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের রাত্তিরে গপ্পো বলবে বলেছে। রাখালদার টাকা নেবে মা? রাখালদা খুব ভাল।'

মা এর কোনও উত্তর দিল না। মিলু বলল, 'চল দাদা আমরা জানলায় বসি গিয়ে। তাহলে বুঝতে পারব রাখালদা আসছে কিনা।'

'তুই বোস গিয়ে', বলল হীরক, 'আমি এখন মার সঙ্গে কথা বলব।'

'আমিও তাহলে মার সঙ্গে কথা বলব।' বলল মিলু, 'রাখালদা দরজায় ধাক্কা দিলেই বুঝতে পারব এসেছে। কি কথা বলবি রে দাদা?'

মাকে এখন অনেক কিছু বলা উচিত তা বুঝতে পারছে হীরক। কিন্তু কী যে বলবে তাই ও জানে না। তাই বোনকে বলল, অনেক দরকারি কথা বলব। তুই বুঝতে পারবি না। তুই তো ছোট।'

মা বলল, 'কোথাও তোদের যেতে হবে না রে। আয় আমরা বসি। রাখাল এলে ওকে একটা কাজে পাঠাব। ও আসুক।'

রাখাল ফিরল বেশ রাত করে। বলল, 'বাইরের ঘরে একটা শতরঞ্চি পেতে দাও বৌদি, আমি শোব। মিলুদিদিমণি ঘুমিয়েছে বুঝি? হিরুবাবু জেগে আছ?'

মার হাত ধরে হীরক দাঁড়াল দরজার কাছে। ঘুমে তখন ওর চোখ জুড়ে যাচ্ছে। তা দেখে রাখাল বলল, 'ও বৌদি ওর তো চোখ জুড়ে আসছে। এখুনি ঢিপ করে পড়ে যাবে। আমি উকিল-বাবুর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন পরশু-তরশু এসে তোমাকে দিয়ে কাগজ সই করিয়ে নেবেন। তারপর কোট কাছারি। এক কাঁড়ি টাকা লাগবে। সে ভেব না। আগে কোম্পানি তো খুলি। তারপর দেখ না কত কাজ করি।'

আরও হয়ত অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল রাখাল। বাধা দিয়ে মা কাতরভাবে বলল, 'রাখাল, তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার।' কথার শেষে থানের আঁচলের গিঁট খুলে কগাছা সোনার চুড়ি বার করে এগিয়ে ধরে বলল, এগুলো বাঁধা দিয়ে, বিক্রি করে, যে করে হোক কাল চারশ টাকা আনতে হবে ভাই। পুরোহিতমশাই এসেছিলেন। তাঁকে তিনশ দিতে হবে। তাতেই তিনি তোমার দাদার শেষ কাজ যা হোক করে করে দেবেন। বাকি একশ হাতে রাখতে চাই। জানি না কবে যে হিরুর জেঠু এসে পড়বেন। ততদিন তো চলা চাই।'

রাখাল বলল, 'ওমা হিরুবাবুর পেটে দেখছি কথা থাকে না। তা না থাক। চিঠি আমি নিজে ডাকে ফেলেছি বৌদি। পেলেই উনি চলে আসবেন। চুড়ি তুমি রাখ। আমার কাছে এখন অনেক টাকা আছে। তা দিয়েই সব হবে।'

মা বললেন, 'না, না, এ চুড়ি তুমি বিক্রিই কর। তোমার টাকা থাক পরে নেব। আর ভাল কথা। কাল হিরুর জেঠুকে একটা টেলিগ্রাম করে দিও।'

একথা শুনে রাখাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে বলল 'আচ্ছা দাও চুড়ি। কাল সকালেই স্যাকরা বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে দেব। তারপর টেলি করব। যাও তোমরা শুয়ে পড় বৌদি। আমি এখানে বেশ আরামে থাকব।'

কগাছা চুড়ি বিক্রি করে মাকে টাকা এনে দিল রাখালদা। হীরক দেখে অবাক হয়ে বলল, 'অনেক টাকা এনেছ তো রাখালদা। দোকানদার তোমাকে এত টাকা দিল?'

দুদিন পরে আবার মা কখানা গয়না বার করে দিল। আবার রাখালদা টাকা এনে দিল।

তারপর একদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কি সব করে হীরক রাখালদার সঙ্গে বাড়ি ফিরল যখন, ওকে দেখেই মিলু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'তুই নেড়া হয়েছিস দাদা? হি হি হি, নেড়া মাথা বেল কামড়া তেলে ভাজা বড়া।'

রাখাল বলল, 'ছিঃ মিলুদিদিমণি অমন বলতে হয় না।'

মিলু বলল, 'হি হি, নেড়ুদা।'

পরদিন বাড়ি ভর্তি লোক। ঠাকুরমশাই মাকে মন্ত্র পড়ালেন। তারপর হীরক বসল মন্ত্র পড়তে। কত কি সব অং বং টং বললেন উনি। তার কোন মানেই বুঝল না হীরক। ওর বারবার মনে হতে লাগল চেয়ারে ফুল দিয়ে সাজান বাবার ছবিটা যেন হাসছে। ঘুম ঘুম পেতে লাগল হীরকের। ভীষণ খিদেও পেল। খুব রাগ হল ওর বাবার ওপরে। কেন এমন করে মরে গেলেন বাবা। না মরলে তো দেখতে পেতেন কেমন পুজো করছে ও আজ। আকাশ থেকে সবাই নাকি দেখতে পায়। তাহলে দেখছেন না কেন বাবা, আমাদের কি ভীষণ বিপদ। তখনি ঠাকুরমশাই কী সব জোরে জোরে বলে পাশে বসে থাকা ও বাড়ির জেঠিমাকে বললেন, 'বড় মা, ওর সব কাজ শেষ। বেশ ভালভাবেই ছেরাদ্দ হল। এখন ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিন। আমি এদিকের সব গুছিয়ে তুলি। ততক্ষণে বেরাম্ভনদের পাকা ফলারের ব্যবস্থাটা করে ফেলুন।'

জেঠিমা সকাল থেকেই এ বাড়িতে আছেন। হীরককে কোলের কাছে টেনে এনে বললেন, 'আয় বাবা, এও দেখতে হল। চল চল ও ঘরে। কিছু মুখে দে আগে। তারপর বিশ্রাম কর।'

সব কাজ মিটতে বেলা শেষ হল। মিলু বলল, 'আমি আর একটা রসগোল্লা খাব জেঠিমা? আমার খিদে পাচ্ছে।'

মা বলল, 'ছিঃ।'

জেঠিমা বললেন, 'ছিঃ কেন? নে তো মা একটা। দেখিস গায়ে রস ফেলিস না যেন। বসে খা নইলে সারা ঘর রস করবি।'

ঠাকুরমশাইদের মালপত্র রিক্সোতে তুলে দিতে গিয়েছিল রাখাল। ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে বলল, 'জেঠিমা, আপনি তো কিছু মুখে দিলেন না। একটু চা করছি আমি। আপনি খাবেন তো?'

জেঠিমা বললেন, 'কর। দেখিস হাত-পা জ্বালাসনে যেন। বেশি করে কর। সবাই চা খাব। যা খাটনি গেল, ওতে গায়ের ব্যথা মরবে।'

মিলু বলল, 'রসগোল্লা খেয়ে, আমিও চা খাব জেঠিমা।'

জেঠিমা বললেন, 'খাবি।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জেঠিমা বললেন, 'তা খরচ খরচা তো অনেক করলি সন্ধ্যা, বলতে বাধা না থাকলে বলবি, টাকা এল কোথা থেকে রে?'

মা কোনও কথা বলার আগেই রাখাল বলল, 'গয়না বেচে জেঠিমা। আমি স্যাকরার কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়েছি। দু দুবার।'

অবাক জেঠিমা বললেন, 'এ তুই করেছিস কি ? ক'গ্রাম ছিল ?'

রাখাল বলল, 'প্রথমবার চল্লিশ গ্রাম, শেষে কুড়ি গ্রাম।

'কত টাকায় বেচেছিস ?'

'প্রথমবার চারশ টাকায়। দ্বিতীয়বার দুশো টাকায়।'

একথা শুনে জেঠিমার মুখ যেন কেমন থমথমে হয়ে গেল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, 'সব তো হল। এখন আমি যাইরে সন্ধ্যা। কাল সকালে আবার আসব।'

রাখাল বলল, চা অনেক বেশি হয়েছে জেঠিমা। আর একটু দেব ?' কেমন করে যেন জেঠিমা ওর দিকে তাকালেন। বললেন, 'না।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে রাখাল বলল, 'জেঠিমা খুব রাগ করেছে বৌদি। দেখ, কাণ্ড হবে। বারবার বললাম, তবু কেন যে গয়নাগুলো বেচতে গেলে !'

মা ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, 'ওকথা থাক। সব খরচ-খরচা দিয়ে থুয়ে, আমার কাছে তো এখন মাত্র তিরিশ টাকা আছে। ওতে আর কদিন চলবে ? হ্যাঁ রাখাল টেলিগ্রামটা করেছিলে তো ?

রাখাল বলল, 'বাঃ আমি কি লেখাপড়া জানি যে করব। তুমি লিখে দাও, আমি এখুনি করে দিচ্ছি। লেখ, ইয়েস নো ভেরি গুড এখুনি চলে এস।'

মিলু বলল, 'বাঃ রাখালদা তুমি তো অনেক ইংরাজী বলতে পার !'

রাখাল বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি জান না মিলুদিদিমণি আমি তো সাহেব হয়ে গিয়েছি। মেমসাহেব বিয়ে করব। ফটর ফটর করে ইংরেজি বলব, থ্যাঙ্কু, ভেরি গুড, ইয়েস, নো, গো, গো কম।'

হি হি করে হেসে মিলু বলল, 'মেমসাহেব বউ তোমাকে মারবে রাখালদা। বলবে ব্যাড, ব্যাড, ভেরি ব্যাড।'

মা বলল, 'হিরু, কাগজ কলম আন। টেলিগ্রামটা এখুনি করতে হবে। তোর চিঠি পাননি উনি মনে হচ্ছে।'

হীরক কাগজ আনতেই মা বলল, 'লেখ, ফাদার এক্সপায়ার্ড কাম শার্প। হীরক গুপ্ত। নিচে জ্যাঠামশাইয়ের নাম ঠিকানাটা লিখে দে। রাখাল, তুমি পোস্ট মাস্টারবাবুকে বলে ফর্মটা ঠিক করে ভরিয়ে নিও। টাকা নিয়ে যাও।'

মার কাছে বানান জিজ্ঞাসা করে সবকিছু লিখল হীরক। মা কাগজ হাতে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

রাখাল কাগজখানা নিয়ে বলল, 'টাকা লাগবে না।'

ও ছুটে চলে গেল টেলিগ্রাম লাগাতে। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'ছেলেটা খুব ভাল রে হিরু। ভাগ্যিস ও এসেছিল, তা না হলে যে কি হত।'

মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে দরজার কাছে ও বাড়ির জ্যাঠামশাইয়ের ডাক শোন গেল, 'হিরু, তোমার মাকে একবার ডাক তো, জরুরী কথা আছে।'

বাইরের ঘরে মা আসতেই উনি বললেন, 'বউমা, সব কাজ তো ভালভাবেই হল মা। কাল তোমার দিদি সকালে এসে নিজে হেঁসেলের ভার নেবেন। কালই তোমাদের অশৌচান্ত। ও নিয়ে ভাবি না। শুনলাম, সব খরচ যোগাড় করেছ গহনা বেচে। তা কত গ্রাম সোনার গহনা বেচলে ? কত টাকা পেলে ? বেচলই বা কে ?'

একথা শুনে মার মুখ কালো হয়ে গেল। মাথা নিচু করে বলল, 'হাতে একটা পয়সাও ছিল না তাই…'

মার কথা শেষ হবার আগেই ব্যস্ত হয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'তা নয় বুঝলাম বউমা। কিন্তু কত গ্রাম বেচলে, তা তো বললে না। কত টাকা পেলে ?'

'ছ গাছা চুড়ি বেচেছি, দুটো দুল, দুটো আংটি পাথর বসান।'

'কত পেয়েছ মোট ?'

'চার'শ, দু'শ, ছয়'শ টাকা।'

'সোনার দাম জান আজকাল ?'

'না, ঠিক জানি না।'

'ছ গাছা চুড়ি অন্তত ষাট গ্রাম সোনা হবে, বাকি সব মিলিয়ে আরও কুড়ি গ্রাম। মোট আশি গ্রাম। পাথরের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন বাজার দর যাচ্ছে দশ গ্রাম, ষোলশ-সতেরশ টাকা। রাখাল ছেলেটি তোমাদের পথে বসিয়েছে বৌমা। সে কোথায় ?'

ভয় পেয়ে হীরক বলল, 'রাখালদা টেলিগ্রাম করতে গেছে জেঠু। এখুনি ফিরে আসবে বলেছে।

'চলে গেছে।' চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাঠামশাই, 'আর এসেছে সে ! ছিঃ ছিঃ বৌমা, তোমার দিদিকে একবার বললে না ? আমরা এতই পর হলাম তোমার। এখন বল, কী ঠিকানা ছেলেটার। থানা পুলিশ করতে হবে তো। তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

মা তেমনি করেই মাথা নিচু করে রইল। কোনও উত্তর দিল না। হীরক দেখল মার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে মেঝেতে। ভীষণ দুঃখ হল হীরকের। ভীষণ রাগও হল ওর ওবাড়ির জ্যাঠা-মশাইয়ের উপরে। আর রাখালদাটাই বা কি ! আসছে না কেন ?

মিলু কাঁদো কাঁদোভাবে বলল, 'মা কাঁদছে জেঠু। তুমি মাকে বকলে কেন ? তুমি দুষ্টু !'

ওবাড়ির জ্যাঠামশাই বললেন, 'ঠিকানা জান না তো ? বাঃ। এমন ছেলেমানুষীও করে।'

এসব কথার কেউই কোন উত্তর দিল না। জ্যাঠামশাই কি যেন ভেবে বললেন, 'দেখ বউমা, একটা রূঢ় কথা বলি, তোমার আপনজনরা তো কেউই তোমার পাশে নেই। জানিও না আর কে কোথায় আছেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা দুদিন আহা উহু করবে। তারপর আর কেউই ফিরেও তাকাবে না। এই পৃথিবী এমনই চিরকাল। ভীষণ বিপদ তোমাদের সামনে। তার মাঝে তুমি যদি এমন ছেলেমানুষী কর তো টিকবে কি করে ?'

মার চোখের জল থামল না।

জ্যাঠামশাই ফের বললেন, 'নিলুর ব্যাঙ্ক বইটা দাও। ওখানে তো তোমার নাম দাখিল করতে হবে। আমি দরখাস্ত লিখে দেব। সই দিও। বাকি যা করার আমিই করব। কেঁদে আর কি করবে বউমা। যাও ব্যাঙ্কের বইটা এনে দাও দেখি।

আলমারি খুলে মা বইটা বার করে দিল। হাতে নিয়ে পাতা খুলে দেখে জ্যাঠামশাই হতাশভাবে বললেন, 'এতে তো দেখছি মাত্র দেড়শ টাকা আছে। অন্য আর কোনও এ্যাকাউণ্ট আছে কোথাও ?'

মা মাথা নাড়ল।

'সর্বনাশ !' বললেন জেঠু, 'হাতে আছে আর কত টাকা ?'

'তিরিশ টাকা।'

'গহনা পত্র আর আছে কিছু ?'

'আরও চারগাছা চুড়ি আছে।'

'যাক, সব সোনা যে তার হাতে তুলে দাওনি তবু রক্ষে। চার গাছায় কম করে হবে চল্লিশ আটচল্লিশ গ্রাম, মোট দাম সাত-আট হাজার টাকা হবে। ও টাকা ভেঙে চলতে পারে কিছুদিন। কিন্তু তার আগে বল তো দেখি, আর কোথাও কি তোমাদের আপনজন কেউ আছেন ? যাকে খবর দেওয়া চলতে পারে ?'

হীরক বলল, 'জ্যাঠামশাই আছেন নীলমাধব গুপ্ত। ফুলবাড়ি থাকেন, দার্জিলিংয়ে। তাঁর কাছেই তো টেলিগ্রাম করতে গেছে রাখালদা।'

'সে আর ফিরেছে !' বললেন জ্যাঠামশাই, 'তুমি আমাকে ঠিকানা লিখে দাও, আমি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।'

ঠিকানা নিয়ে ওবাড়ির জ্যাঠামশাই চলে গেলেন।

মা তারপর শুধু ঘর বার করতে লাগল। হীরক ভয় পেয়ে বলল, 'তুমি অমন করছ কেন মা? একটু বস না।'

মা বলল, 'দু-তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, রাখাল ফিরছে না কেন? পোস্ট অফিস তো বেশি দূরে নয়।'

অন্ধকার ঘনাল যখন, তখনও রাখাল ফিরল না। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মা বলল, 'হিরু, সত্যিই আমরা বিপদে পড়েছিরে। কাকে বিশ্বাস করব? কার কথা শুনব? রাখালও শেষ পর্যন্ত অমন করল! ও কি তাহলে আমাদের ঠকাবে বলেই এসেছিল!'

মিলু ভীষণ রাগ করে বলল, 'রাখালদা পাজি, ও এলে আমি মারব। তুমি কিন্তু কেঁদ না মা। আমি ঠিক ওকে মারব।'

হীরক বলল, 'তাহলে এখন কী হবে মা? রাখালদা বোধ হয় চিঠি ডাকেই দেয়নি তাহলে।'

মা বলল, 'কী জানি, কি করে আর ওকে বিশ্বাস করতে পারি বল। ওর পেটে যে এত দুষ্টবুদ্ধি তা কি করে জানব?'

মা ওদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল।

মিলু মাকে যেতে দেখেই বলল, 'আমাদের খুব বিপদ হল নারে দাদা? তাহলে কি হবে রে? আমরা আর স্কুলে যাব না? না গেলে আণ্টি খুব রাগ করবেন। ভীষণ বকবেন। বাবা তো মরে গেছেন, কে তাহলে আমাকে স্কুলে রোজ দিয়ে আসবে?'

হীরকের তখন মনে হচ্ছিল ওবাড়ির জ্যাঠামশাই ঠিকই বলেছেন, ভীষণ বিপদ ওদের সামনে। জেঠিমা জ্যাঠামশাই ছাড়া আর কেউই ওদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কি হবে ওদের! কে স্কুলে নিয়ে যাবে ওর বোনকে? কে মাসে মাসে মাইনে দেবে স্কুলের? কোথা থেকে মা টাকা পয়সা পাবে? কী করে ওরা চাল ডাল কিনবে? তাহলে কী হবে ওদের?

চারদিকের সব কিছু ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল হীরকের। সব খারাপ, সব কিছুই খারাপ। লোকজন মানুষরাও খারাপ, খারাপ না হলে এমন বিপদ হয় ওদের।

মিলু কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কথা বলছিস না কেনরে দাদা? কি হল তোর? কথা বলছিস না কেন?' কথায় ওর কান্নার সুর।

হীরক বলল, 'লক্ষ্মী বোন তুই মাকে কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করিস না। আমি তোকে রোজ স্কুলে নিয়ে যাব। আমি নিয়ে আসব। আমি তো বড় হয়ে গেছি। তুই কখনো মাকে কিছু বলবি না। বুঝলি?'

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মিলু মাথা নাড়ল। বলল, 'মা কাঁদবে নারে দাদা?'

হীরক বলল, 'হ্যাঁ।' ও তখন ভাবছিল, ওরা কি আর স্কুলে যেতে পারবে। কে ওদের মাইনে দেবে? শেষে ও হয়ত একদিন মতিদার মতই হোটেলের ছেলে হয়ে যাবে। কত টাকা মাইনে পায় মতিদা। অনেক নিশ্চয়ই। তা নইলে রোজ দুপুরে ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় কী করে? বেশ হয় ও যদি অমনি একটা কাজ পায়। মাসে মাসে তাহলেই তো মাকে অনেক টাকা দিতে পারবে। তাহলে আর ওদের কষ্টই থাকবে না!

সারা রাত ভাল করে ঘুমাতে পারল না হীরক। সারা রাতে রাখালও আর ফিরল না। হাওয়ায় বহুবার বাইরের দরজা নড়ে উঠেছিল। প্রথম দুবার মা, 'রাখাল এলি?' বলে দরজা খুলে দিয়েছিল। রাখাল আর আসেনি। ভোর হয়ে গেছিল। নিয়মভঙ্গের খাওয়া খেয়েই হীরকের ভীষণ শীত শীত করতে লাগল। সবাই চলে গেলে জেঠিমা কপালে হাত রেখে বললেন, 'যা ভেবেছি তাই, ছেলের জ্বর হয়েছে। এতটুকু ছেলে, অত ধকল সইবে কেন? নে নে শুয়ে পড়। রাতে উপোস দিবি। ভোরে জ্বর না ছাড়লে ডাক্তার ডাকতে হবে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি জ্বর। ভয় পাসনি সন্ধ্যা, ও কিচ্ছু না।'

তারপর যে কী হয়েছিল তা আর ভাল করে হীরকের মনে নেই। যেদিন ভাল করে চোখ খুলল, দেখল মাথার কাছে বসে মা। ঘরে একটা টিম টিম করে আলো জ্বলছে। মার চোখ মুখ কেমন যেন শুকনো। কি যেন ভাবছে মা আপন মনে। ওর খুব অসুখ হয়েছিল নিশ্চয়ই। সারা ঘরে ওষুধ ওষুধ গন্ধ। হাতের দুপাশে কাঁধের কাছে ব্যথা। নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুরা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। কী হয়েছিল ওর? আস্তে হীরক ডাকল, 'মা।'

চমকে ফিরে তাকাল মা। একি দেখতে হয়ে গেছে মা! আস্তে ঝুঁকে পড়ে হীরকের গালে নিজের গাল রাখল মা। কি ভালই না লাগল হীরকের। মনে হল সব অসুখ ওর সেরে গেছে। হীরক বলল, 'মা, রাখালদা ফিরে এসেছে?'

ভীষণ খুশিতে মা বলল, 'ওসব কথা থাক বাবা। তুই যে ভাল হয়েছিস, এতেই আমার সব। কিছু খাবি? হরলিক্স করে দেব?'

পরদিন সকালে মিলু বলল, 'তোর না দাদা নিমুনি হয়েছিল। তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিলি। আর চোখ বড় বড় করে কী সব বলছিলি। বলছিলি সবাই খারাপ, সব্বাই, আমাদের ভীষণ বিপদ। রাখালদা চোর, আরও কত কথা! শুনে মা না কত কাঁদছিল। এখন আর কিন্তু ওসব বলিস না। এখন তো তুই ভাল হয়ে গেছিস আমার না, কী ভীষণ ভয় করছিল।'

ঘরে তখন মা ছিল না। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে হীরক চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে মিলু মার কাছে আর টাকা আছে তো রে? ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, ওষুধ দিয়েছিল, কত টাকা নিয়েছিলেন রে?'

ফিস ফিস করে মিলু বলল, 'অনেক টাকা দাদা। তোমাকে না কিছুতেই ওষুধ খাওয়ান যাচ্ছিল না, খালি খালি বমি করে দিচ্ছিলে। তখন ডাক্তারবাবু না তোমাকে প্যাটপ্যাট করে ইনজেকশন দিলেন। ওবাড়ির জেঠুকে মা আবার চুড়ি দিয়েছে। জেঠু টাকা এনে দিয়েছে।'

একথা শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল হীরকের। আপন মনেই বলল, 'কেন যে আমার অসুখ হল!'

মিলু বলল, 'ওই যে তুমি গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলে, ডাক্তারবাবু বলেছেন তাতেই তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে। চান না করলে অসুখ করত না।'

হীরক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'সব কিছু কেমন কেমন হয়ে গেল নারে মিলু? বাবা মরে গেলেন, আমাদের ভীষণ বিপদ হল। রাখালদা চোর হয়ে গেল, আর আমারও বিচ্ছিরি অসুখ হল। সব খারাপ। মার কত কষ্ট, আমার আর কিছুই ভাল লাগছে নারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলু বলল, 'আমারও দাদা। আর আমাদের স্কুলে যাওয়া হবে না দেখিস।' একথা বলে হঠাৎ মিলুর মনে হল দাদা ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কী করছে। তাড়াতাড়ি ওপাশে গিয়ে দেখল দাদা কাঁদছে। চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে!

আস্তে দাদার মাথার কাছে বসে ও দাদার চোখের জল হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'কাঁদিস না দাদা। তুই কাঁদলে মার তো খুব কষ্ট হবে। মাও কাঁদবে। কাঁদিস না।'

কান্নাভরা গলায় হীরক জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের জেঠু এসেছিল রে?'

'না দাদা। ওবাড়ির জ্যাঠামশাইও নাকি টেলিগেরাম করেছিল। তবুও আসেনি। জেঠু আসবে নারে দাদা।' ভীষণ দুঃখে বলল মিলু।

এমন সময় মা ঘরে এল এক হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে। বলল, 'হিরু বাবা, তোর বন্ধু তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এস এস, ভিতরে এস। বন্ধু তোমার এখন ভাল আছে।'

অবাক হীরক দেখল কেমন যেন ভয়ে ভয়ে মতিদা ঘরে ঢুকে দরজার পাশে দাঁড়াল। হাতে ওর ঘুড়ি লাটাই কিছুই নেই। গায়ে জামা পরা।

মা বলল, তোর বন্ধু রোজ তোর খবর নিয়ে গেছেরে। একদিন

ঠাকুর বাড়িতে পুজো দিয়ে পুজোর ফুল দিয়ে গিয়েছে। বড় ভাল ছেলেরে। এস এস, কাছে এসে দেখ, কথা বল বন্ধুর সঙ্গে।' মা মতিকে ডাক দিল।

মতি ভয়ে ভয়ে আরও ক'পা এগিয়ে এসে বলল, 'ওই যে মোড়ের মাথায় শিব মন্দির আছে, খুব জেরাগ্গত। পাঁচ সিকের পুজো দিয়েছিলাম। তবে না ভাল হলি তুই। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, সামনেই বিশ্বকম্মা পুজো, ছাদে লাটা মাঞ্জা দেব। সব শিখিয়ে দেব তোকে। এখন যাই, এ্যাঁ?' বলেই মতি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। মা বলল, 'আবার এসো কিন্তু।'

কোন উত্তর না দিয়ে, মুখ না ঘুরিয়েই মাথা নাড়ল মতি। ও তখন পালাতে পারলে বাঁচে। চায়ের দোকানের বয়, বাবুদের বাড়িতে ঢুকেছে বুঝতে পারলে সবাই এদের ছি ছি করবে না।

দুদিন পরে হীরক বিছানায় উঠে বসল। ডাক্তারবাবু বুক পিঠ ঠুকে, কানে স্টেথো লাগিয়ে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন। একটা কাগজে হিজিবিজি ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বললেন, 'ছেলে আপনাদের এখন সুস্থ হয়েছে। তবে কি জানেন শুধু ওষুধেই ওর স্বাস্থ্য ফিরবে না, কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যান। কাছে পিঠে হলেও চলবে। যে কোনও জায়গায়।'

জেঠিমা বললেন, 'তোকে যা বলেছি তাই কর সন্ধ্যা। হাতে টাকা পয়সা থাকতে থাকতে একবার সবাইকে নিয়ে তোর ভাসুরের ওখানে ঘুরে আয়। থাকতে দেয় তো থেকে যাবি। না দেয় তো ফিরে আসবি, তখন যা হোক কিছু করার সময় থাকবে। তা নইলে এখানে বাড়িওয়ালা পথে বার করে দিলে, ওখানে ঝাঁটা খেয়ে আর ফিরতে পারবি না।'

মা বলল, 'দুখানা টেলিগ্রামের জবাব দিলেন না উনি দিদি, তার মানে তো স্পষ্ট।'

'এমন তো হতে পারে টেলিগ্রাম পাননি। এদেশে তাও সম্ভব।'

'হিরু চিঠি লিখেছিল দিদি।'

'তাও পান নি। ওরে, অত হিসাব-নিকাস করিস না এখন। যা গিয়ে দেখ কেমন ব্যবহার করেন তিনি। তারপর যা অদৃষ্টে আছে তা তো হবে।'

মা তবুও বলল, 'হিরুর এই শরীর, এখন কী করে যাব দিদি?'

ভীষণ ধমকে ওবাড়ির জেঠিমা বললেন, 'আজই তোকে যেতে বলছি না। ডাক্তার বললে যাবি। ওকেও তো চেঞ্জে যেতে বলেছেন। তবে?'

মার কথা থাকল না। জ্যাঠামশাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে টিকিট কেটে দিলেন রেলের। বললেন, 'ওদিকের সঠিক খবর কেউ দিতে পারল না। শিলিগুড়িতে গাড়ি বদল করে ছোট লাইনের গাড়ি ধরবে। তোরষাঘাট স্টেশনে নেমে ফুলবাড়ি খুঁজে নেবে। অসুবিধা কিছু হবে না। হোটেলের বয় মতি তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। হাল্কা হাত-পায়ে যেও। কাপড় জামা ছাড়া কিছু সঙ্গে নিও না।'

সেদিন জ্যাঠামশাই চলে যেতেই মা আবার খুব কাঁদল। হীরক আর মিলু চুপ করে মার পাশে বসে রইল। কেন যে মা কাঁদছে তা তার বুঝতে পারল না। রেলে চড়ে অনেক দূরে যেতে পারবে ভেবে ওদের বেশ মজা হয়েছিল। কিন্তু মা যখন কাঁদছে, তখন ওরা এটুকু বুঝল, তাতেও ওদের বিপদ কাটবে না। একসময় মা বলল, 'হিরু, এ পাড়ায় এতদিন ওবাড়ির জেঠিমা আর জেঠুই আমাদের দেখাশোনা করছিলেন। আর ওরা পারছেন না। চল ভিনদেশে জেঠুর কাছে গিয়েই থাকবি। তিনি ছাড়া আমাদের তো আর কেউ নেইরে।'

ভয়ে ভয়ে হীরক বলল, 'যদি আমাদের থাকতে না দেন তবে কী হবে মা?'

ছেলেমেয়েকে বুকে টেনে এনে মা বলল, 'তিনি যা করুন না কেন তিনিই আমাদের আপন। দুঃখ সয়ে আমাদের মানিয়ে থাকতে হবে রে। নইলে যে আমাদের আর কোনও যাবার জায়গা নেই।'

আবার সবকিছু ভীষণ বিচ্ছিরি মনে হতে লাগল হীরকের। সব খারাপ, সবাই খারাপ। এত খারাপের মাঝে ওই অনেক দূরের জেঠুই কি আর ভাল হবে? কি যে হবে ওদের কে জানে।

মিলু বলল, 'আমরা আর স্কুলে যাব না মা?'

এ কথার আর কোনই উত্তর দিল না মা। মার মুখের দিকে তাকিয়েই মিলুও যেন বুঝতে পারল, এ নিয়ে আর মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। জিজ্ঞাসা করলেই মা হয়ত কাঁদবে। মার খুব দুঃখ।

যাওয়ার দিন ঠিক হতেই মার কাজও বাড়ল। বাড়ির অনেক জিনিসপত্র মা একে ওকে দিয়ে দিতে লাগল। কি হবে এক বাড়ি জিনিস রেখে। দূর দেশের জ্যাঠামশাই যদি ওদের থাকতে না দেন, তা হলেও এ বাড়িতে হীরকদের আর বেশি দিন থাকা হবে না। এ বাড়ির অনেক ভাড়া। অত ভাড়া মা দেবে কি করে? মা তো অফিসে যায় না। কোম্পানীতেও মাল চালান দেয় না।

মতিদা রোজ দু ঘণ্টা মাকে সাহায্য করে। এ জিনিসটা টেনে ওখানে সরায়, ও জিনিসটা ওদিকে রাখে। আর বলে, 'বুঝলে বড়মা, আমার না, একটাও জুতো নেই। হিরুর একজোড়া জুতো আমি নেবই। কারও কথা শুনব না। আমার পায়ে ওর জুতো ঠিক লাগে।'

মা হেসে বলেছে, 'বেশ তো নিও। দু জোড়ার যেটা তোমার পছন্দ সেটাই নিও। তুমি আমার কত কাজ করে দিচ্ছ। না হলে বড় কষ্ট হত।'

সব জিনিসপত্র দিয়েও দুটো বড় বড় বোঝা হল। একটা বিছানার, অন্যটা অন্য সবকিছুর। মতিটা এমন বোকা, বাড়তি জুতোগুলো সব বিছানার মধ্যে কাগজ মুড়ে ঢুকিয়ে দিল। মিলু অনেক বলল, শেষে বকল। তাও ও শুনল না। মিলু ছুটে গিয়ে মাকে বলল, 'মা, মতিদাদা না একদম বোকা, জুতো বিছানায় দিয়েছে। জুতো কেউ বিছানায় দেয়?'

ওর কথার উত্তর পাবার আগেই হীরক ডাকল, 'এই মিলু শোন, এদিকে আয়। এই দেখ এগুলো রেলের টিকিট। কি বিচ্ছিরি দেখতে। মার আস্ত, তোর আর আমার আধখানা! তুই একদম ছোট তো তাই।'

মা বলল, 'খোকা টিকিটগুলো রেখে দে জায়গায়। হারালে মুস্কিল হবে।'

মিলু বলল, 'আমার আদ্ধেক তোরও আদ্ধেক, তুইও তো ছোট আছিস দাদা।'

বেলাবেলি ট্যাক্সি এল। পাড়ার সবাই এল সেই সঙ্গে। সবাইকে প্রণাম করে ট্যাক্সিতে উঠল হীরক। তখন ওর মন খুব খারাপ। মা আবার ঠিক আগের মত কাঁদছে। মুখে আওয়াজ নেই। চোখে জল। জেঠিমা, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দুর্গা, দুর্গা।

একটা গাড়িতে জ্যাঠামশাই আর মালপত্র। অন্য গাড়িতে মার সঙ্গে হীরক আর মিলু। সামনে লাল জুতো পায় দিয়ে বসেছে মতিদা। গাড়ি ছাড়ার আগেই উপরের হরিহরবাবু এগিয়ে এলেন কাছে। হীরককে বললেন, 'যাচ্ছ তাহলে? বেশ ভাল কথা। দরকার পড়লে খবর দিও, আমি আছি উপরে। আহা হাঃ, গাড়ির বাইরে হাত বার কর না। খুব খারাপ অভ্যাস। বিপদ ঘটতে পারে।'

পাড়া ছাড়িয়ে গাড়ি বড় রাস্তায় পড়তেই মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাত তুলে মোড়ের শিবঠাকুরকে প্রণাম জানাল। বলল, 'হিরু, মিলু, ওখানে গিয়ে তোরা কিন্তু খুব ভাল হয়ে থাকবি। জ্যাঠামশাই ভীষণ রাগী। দেখ না রাগ করে তোর বাবাকে আর কোনদিন চিঠি

লেখেননি। জ্যাঠামশাই যখন যা বলেন, সব কথা শুনিস । বুঝলি।'

দুজনেই চার পাশের গাড়ি বাড়ি রাস্তার মজা দেখতে ব্যস্ত ছিল। দুজনেই একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

মা যেন আপন মনেই বলতে থাকল, 'এতদিন মাথার উপর ছাদ ছিল। দুবেলা খাবার খোরাক ছিল। স্কুল ছিল। আর এখন এই এতবড় পৃথিবীতে যেন আমরা হারিয়ে যেতে বার হয়েছি। কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, কিছুই জানি না। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, তাও জানি না। হে ভগবান, আমাদের রক্ষা কর।'

স্টেশনে নেমে মিলু তো ভয়ে জড়োসড়ো। মার হাত শক্ত করে ধরে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগাল। হীরকও রেলগাড়ি আর লোকজন দেখে অবাক। জ্যাঠামশাই বললেন, 'রাস্তায় জ্যামের ভয়ে তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছি আমরা। আমাদের গাড়ির এখনও দু ঘণ্টা দেরী। চল প্লাটফর্মের ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

কুলিরা খালি প্লাটফর্মের ধারে মাল রেখে চলে গেল। নিজের জন্য প্লাটফর্ম টিকিট কিনে জেঠু এসে বিছানার উপরে চেপে বসলেন। মতিকে বললেন, 'মাল গুণতি করে গাড়ি থেকে নামিয়েছিলি, গুণতি করে তুলে দিবি।'

বেশ কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এল প্লাটফর্মে। মাল তুলে ওদের জায়গা মত বসিয়ে দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'এবারে আমি চলি বউমা। সাবধানে যেও। ভয় পেও না। তেমন বুঝলে না হয় ফিরে এস। কিন্তু থাকার চেষ্টা করবে। তাতেই সবার মঙ্গল।'

মতিদা চুপি চুপি বলল, 'সেদিন মেরেছিলাম তোকে। তার জন্য রাগ নেই তো তোর ?'

লজ্জায় লাল হয়ে হীরক বলল, 'ধ্যাৎ।'

ওরা চলে গেল। মা আবার কাঁদতে আরম্ভ করল। জানালার ধারে বসে হীরক বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। মিলু শুধু মাঝে মাঝে মার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল। কখন যে ট্রেন ছাড়বে কে জানে। কলকাতার সব কিছুই তো প্রায় খারাপ। খারাপ না হলে এমন করে ওদের চলে যেতে হয়। যাচ্ছে কোথায় তাও জানে না। কি যে হবে ওদের কে জানে।

হঠাৎ চমকে উঠল হীরক। ওই যে রাখালদা না ? ওর মতই নেড়া মাথা হয়েছে। তেমনি একটি ঝোলা কাঁধে। সব গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি দিতে দিতে ওদের দিকেই আসছে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল হীরক, 'রাখালদা, রাখালদা, এই যে আমরা এখানে।' তখুনি ওর ভয় হল ভীষণ, একি বোকামী করল ও। ডাক শুনে রাখালদা যদি এখন পালিয়ে যায়। রাখালদা তো চোর।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রাখাল। মুখ ওর ভরে গেল হাসিতে। এক ছুটেও এসে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল ওদের কামরায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তাহলে ভগবান আছে হিরুবাবু, আর একটু হলেই গাড়ি ছেড়ে দিত।'

অবাক হীরক দেখল গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছে। দূরে ইনজিনের ভোঁ একটানা বেজে চলেছে।

এক পাশে বসে পড়ে রাখাল বলল, 'বেশ লোক যা হোক তুমি বৌদি। অমনি আমাকে চোর ভেবে বসলে। আরে, আমি বলে কখনও কারও এক আধলা ছুঁই না।'

অবাক মা জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ? সেই যে গেলে আর কোনও খবর নেই।

একথা শুনে রাখাল মাথা নিচু করল। বলল, 'দেশে চলে গেছিলাম বৌদি। পোস্ট অফিসের কাজ শেষ করে ভাবলাম, উকিলবাবুর কাছে যাই। শিয়ালদার কাছে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, সে-ই বলল, মার অবস্থা এখন তখন। না গেলে আর দেখা হবে না। সেই যে গেলুম আর ফেরা হল না। ছেরাদ্ধ করে তবে ফিরছি। বাবা কবেই গেছে, মাও চলে গেল, ব্যস আমারও আর কেউ নেই। আজই ফিরেছি দুপুরে। পৌঁছে শুনি সবাই আমাকে চোর ভেবে বসে আছ। না না বৌদি, তোমার একখানা গয়নাও আমি বিক্রি করিনি। বিক্রি করতে গিয়ে কি জেলে যাব ? সব আছে আমার কাছে এই ঝোলায়। টাকা তো আমি আমার থেকে দিয়েছিলাম। এখন জ্যাঠাবাবু যদি আমাকে একটা কাজ দেন তো আমিও তোমাদের সঙ্গেই থেকে যাব। বেশ হবে তাহলে হিরুবাবু, না ?'

মিলু বলল, 'কী ভীষণ বোকা না তুমি রাখালদা, মিছিমিছি সবাই তোমাকে কত বকল। আর কখনো এমন কর না, বুঝলে ?'

হেসে রাখাল বলল, 'তা আর বলতে মিলুদিদিমণি। আর বোকামি করি।'

হীরকের মনে হল, তাহলে বোধহয় এই পৃথিবীটা তত খারাপ নয়। কী জানি দূর দেশের জেঠুও হয়ত ভাল মানুষই হবে।

তাই যেন হয়। তাহলে আর কাউকেও এতটুকু খারাপ ভাববে না হীরক।

ভোরবেলা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাল ওরা। রাখালদাও টিকিট কেটেই গাড়িতে চড়েছে। তাই কোনও গোলমাল হল না ওদের। ছোট লাইনের মজার ট্রেন ঘণ্টাখানেক চলতেই ওরা পৌঁছেছে ওদের স্টেশনে। তাড়াহুড়ো করে সব মাল নামাল রাখালদা। গাড়িটা চলে যেতেই স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল। চারদিক দেখে মা ভয় পেয়ে বলল, 'হ্যাঁরে খোকা, আমরা ঠিক জায়গায় নেমেছি তো ?'

রাখালদাও বেশ ঘাবড়ে গেছিল। বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে বৌদি। কিন্তু একি, এ তো ভীষণ ছোট্ট ইসটিশন। এখান থেকে এখন আমরা কোন দিকে যাব ? আর যাবই বা কিসে ?'

একজন কালো পোশাক পরা লোক স্টেশনের ঘর থেকে বার হয়ে এসে হীরককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি কলকাতা থেকে আসছ খোকা ?'

হীরক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'যাবে কোথায় ?'

'ফুলবাড়ি বাগিচায়, নীলমাধব গুপ্তর কাছে।'

ভদ্রলোক মহাখুশি হয়ে বললেন, 'তাই বল!' বলেই চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে হরিয়া, হরিয়ারে, কই গেলি, আয় আয় এদিকে, আরে ফুলবাড়ির ডাক্তারবাবুর বাড়ির সবাই এসে গেছেন। আমার কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে বসা।'

মাথায় পাগড়ি বাঁধা একজন এসে একগাল হেসে বলল, 'এই দেখুন, আপনারা আসিয়ে গেলেন, ইধারে ডাংদারবাবু দু'দুবার কলকাত্তা ছুটিয়ে গেলেন, আপনাদের পাত্তা পেলেন না! চিট্টি লিখেছেন ঠিকানা দেন নাই। ই বড় তাজ্জব বাত আছে। টেলি করলেন, তাতেও ভি ঠিকানা লিখা নাই। ডাক্তারবাবু তো কাল ফিরেছেন। আসেন, এখন মাস্টারবাবুর বাসায় চলেন, চানটান খাওয়া দাওয়া করুন, আমি বসির আর আহামদকে খবর দি টাঙ্গা আনার জন্য। বিকালে বাগিচায় যাবেন।'

হীরকের আবার মনে হল, না তো পৃথিবীটা তো তত খারাপ নয়। মা বলল, 'হ্যাঁরে হিরু, চিঠিতে টেলিগ্রামে আমাদের ঠিকানা দিসনি ?'

ভীষণ লজ্জা পেয়ে হীরক বলল, 'বাঃ, রাখালদা যা বলল, তাই তো আমি লিখেছি। আমাকে বলছ কেন ?'

স্টেশনমাস্টারবাবু বললেন, 'যাকগে যা হবার তা তো হয়েইছে দিদি। এখন আমার বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। গাড়ির ব্যবস্থা হলেই চলে যাবেন।'

হরিয়ার পিছন পিছন ওরা এল মাস্টারবাবুর কোয়ার্টারে।

সেখানে উনি একলা থাকেন। হরিয়া রাম্নাঘর মাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ আপনি বহুত বড়িয়া করে রাঁধেন। আমরা সবাই খাব। চাল, ডাল, আটা, তেল, নুন সব আছে। পিছনের ক্ষেতিতে কিছু সব্জিভি আছে। সব দেখিয়ে লিন। আমি সাইকেল নিয়ে যাব জীপ ডাকতে। ফিরতে দু'তিন ঘণ্টা নিবে।'

কথার শেষে ও বারান্দা থেকে সাইকেলটা টেনে নিচে নামাল।

ও চলে যেতেই রাখাল বলল, 'দেখলে বৌদি, কেমন কাজে ফাঁকি দিয়ে পালাল। তুমি সর, আমি রান্না করব। এইসা লঙ্কা দেব না যে সবার জিভ জ্বালা করবে।'

মা বলল, 'না, যা পারি আমিই করছি। দেখতো বাগানে কি সব্জি পাওয়া যায়।'

খেতে বসে মাস্টারবাবু মহা খুশি হয়ে বললেন, 'ডালটা যা হয়েছে না, এমন অনেকদিন খাইনি দিদি। মাঝে মধ্যে ছুটিতে ফুলবাড়িতে গিয়ে পাতা পাতব। তাড়াতে পারবেন না কিন্তু।'

মা কিছু বলার আগেই বাইরে স্টেশনের ধারে ভীষণ চেঁচামেচি শোনা গেল : কে যেন কাকে ভীষণ বকাবকি করছেন। বলছেন, 'দূর করে দেব, চাকরি খতম করে দেব। বসে বসে শুধু গিলবে, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। কই কোথায় গেলে হে মাস্টার ?'

আরাম করে হাত চাটতে চাটতে মাস্টারবাবু বললেন, 'ওই, মেঘ না চাইতেই জল। ফুলবাড়ির ডাক্তারবাবু নিজেই এসে গেছেন। তবে আর চিন্তা করবেন না দিদি। তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে নিন। অনেক দূরের পথ যেতে হবে।'

ওদিকে ফের চিৎকার শোনা গেল, 'ব্যাপার কি! কেউ কোথাও নেই নাকি ? সরকারি মালপত্র চুরি হলে কে দায়ী হবে ? নাঃ, এই মাস্টারের নামেও দেখছি রিপোর্ট করতে হবে।'

হেসে মাস্টারবাবু বললেন, 'উনি ভীষণ রাগী দিদি। এত ভীষণ রাগী যে এখানে ওকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করে।' বলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তা রিপোর্ট করুন আর যাই করুন, তা পরে করবেন। আগে এদিকে আসুন তো, দেখে যান ব্যাপার কি ?'

'ব্যাপার ? ব্যাপার আবার কি ?' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে একজন রোগা লম্বা ভদ্রলোক এসে বারান্দার সামনে দাঁড়ালেন। সাহেবী পোশাক পরা, মুখে পাইপ, তা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। মা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। মিলু ভয় পেয়ে মার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। হীরক শকরি হাতে উঠে দাঁড়াল আসনে।

ভদ্রলোক এক নজরে চারদিক দেখে জুতো পরেই দালানে উঠে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন মার সামনে। কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সন্ধ্যা না ?'

মা মাথা নাড়ল। তারপর ঝুঁকে ওঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি বললেন, 'থাক থাক বউমা। বুড়ো বয়সে শেষে এও দেখতে হল আমাকে।'

হাত মুখ ধুয়ে একটা চেয়ার বার করে দিলেন মাস্টারবাবু। তাতে বসে উনি বললেন, 'হিরু বাবাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলে, তাতে সে ঠিকানা দেয়নি। ছুটে কলকাতায় গিয়ে দেখি অবিনাশ বিদেশে গেছে কাজে। অনেক খুঁজেও তোমাদের পেলাম না। কি করি, কোথায় যাই, ভাবলাম যদি বুদ্ধি করে তোমরা এখানে চলে আস। তাই ফিরে এলাম। কদিন পরে আবার টেলিগ্রাম এল, সেই ভুল, পোস্টাপিসের নম্বর আছে ঠিকানা নেই। ছুটে গেলাম সেখানে, তারা বলল, অমন নাম তারা জানে না। অবিনাশ সেই যে বিদেশে গেছে, তখনও ফেরেনি। সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমাদের এখানে চলে আসতে বলে, কাল ফিরেছি। যদি তোমরা ভোরের গাড়িতে আস তাই স্টেশনে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাল ফিরেই একটা শক্ত কেস নিয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাতে ফিরি। কেউ আর তাই আমাকে সকালে ডেকে দেয়নি। পথে কষ্ট হয়নি তো বউমা তোমাদের ?'

হীরক হাত ধুয়ে এসে জেঠুকে প্রণাম করল। উনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। সেখানে যেন কেমন ওষুধ ওষুধ গন্ধ। আস্তে হীরকের গালে দাড়িওয়ালা ওর নিজের গাল ঘষে দিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ক্লাসে পড় ?'

হীরকও ফিস ফিস করে বলল, 'ক্লাস সিক্সে।'

উনি খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ।'

মা বলল, 'মিলু, যাও ও'কে প্রণাম কর।'

মিলু বলল, 'না যাব না।'

মা বলল, 'ছিঃ, যাও।'

মিলু কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'না যাব না বলছি।'

উনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

জ্যাঠামশাই অবাক হয়ে বললেন, 'কেন আসবে না মা, কেন ?'

'ভয় করে, তুমি ভীষণ বকবে।'

'তোমাকে ? কে বলেছে ? তুমি তো আমার লক্ষ্মী মামণি, তোমাকে আমি কখনও বকব না। কখনও না।' ঝুঁকে পড়ে উনি মিলুকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, চল আমরা স্টেশনে গিয়ে বসি। বউ মা তুমি খেয়ে নাও মা। একটু বিশ্রাম করেই আমরা রওনা দেব। দেরী কর না।'

কোলে উঠে ভয়ে মিলু কাঁদবে ভেবেছিল। বড় বড় চোখ করে জেঠুকে দেখে কিন্তু ওর কাঁদতে ইচ্ছা হল না। কই জেঠু তো ওকে বকছে না। মাকেও চলে যেতে বলছে না। তবে কেন কাঁদবে ও ভয়ই বা পাবে কেন ?

স্টেশনের বেঞ্চে বসে জেঠু বলল, 'হিরুবাবা, তুমি আমার এই পাশে বস। আর একটু পরেই তোমরা তোমাদের নিজেদের বাড়িতে যাবে। সেখানে বাগানে কত ফুল, কত ফল। কত বড় বড় গাছ। দূরে নদী বন পাহাড়। সব আমি তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাব। আর ওই যে বাইরে দেখছ জীপটা দাঁড়িয়ে, ওটা আমার নিজের জীপ। ফুলবাড়িতে মটর নেই। ওখানে সবাই নিজের জীপ রাখে। আর আছে ঘোড়া। তোমাকে চড়া শিখতে হবে। সব আমি নিজে তোমাকে শেখাব।'

কোলে বসে সব কথা অবাক হয়ে শুনছিল মিলু। বলল, 'আমিও ঘোড়ায় চড়ব জেঠু।'

জেঠু বলল, 'হ্যাঁ চড়বে মামণি। তোমার জন্য একটা ভাল দেখে টাট্টু ঘোড়া কিনতে হবে।'

মিলু খুশি হয়ে বলল, 'সে ঘোড়ায় চড়ে আমি না রোজ স্কুলে যাব জেঠু। কতদিন যে স্কুলে যাই না।'

মিলুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জেঠু বললেন, 'হ্যাঁ মা, কটা দিন বিশ্রাম করবি, তারপর তোকে আর দাদাকে জোড় পাহাড়ির সরকারি স্কুলে ভর্তি করে দেব। ঘোড়ায় নয় মা। বাড়ির জীপে চড়ে রোজ যাবি আসবি। আগে তো বাড়ি চল।'

মিলুর মনে হল, সবাই ওকে ভীষণ মিথ্যা কথা বলেছে। জেঠু ওদের খুব ভাল। একেবারে বাবার মত ভাল।

হীরকের মনে হল, এতদিন ও যা সব ভেবেছে সব ভুল। এই পৃথিবীর সব কিছু ভাল, খুব ভাল। সবাই ভাল বলেই না ওদের ভীষণ বিপদ কেমন আপনি আপনি কেটে গেল।

কেমন যেন একটা সুন্দর ফুলের গন্ধ আসছিল মাস্টারবাবুর ঘরের দিকের বাগান থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়েও আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'জেঠু, কোন ফুলের গন্ধ আসছে জেঠু ?'

জেঠু বলল, 'ও তো কুর্চি ফুলের গন্ধ বাবা। এদিকে ও ফুল অনেক হয়। আমাদের বাগানেও ও গাছ আছে। ভাল গন্ধ, তোমার ভাল লাগছে বাবা ?'

মাথা নেড়ে হীরক বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে জেঠু।'

এমন সময় রাখাল এসে ঢপ করে প্রণাম করল জেঠুকে। জেঠু হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, তুমি আবার কে হে বাপু ?'

হীরক বলল 'ও তো আমাদের রাখালদা জেঠু। ওরও না কেউ নেই। ওকেও আমাদের কাছে রাখবে জেঠু ?'

জেঠু হেসে বললেন, 'তাহলে তো ওকে রাখতেই হয় তোমাদের সঙ্গে।'

আনন্দে বোধ হয় চিক চিক করে উঠল মিলুর চোখ দুটো।

জেঠু বললেন, 'রাখাল, যাও তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই রওনা হতে হবে। অনেক দূরের পথ যেতে হবে। পৌঁছতে রাত হবে। যাও যাও, দেরী কর না।'

হীরকের তখনও মনে হচ্ছিল, দূরের ফুলের গন্ধটা ভারী সুন্দর ভারী সুন্দর। খুব সুন্দর !

ছবি : পোলারিশ

# কিশোর মন

## আগামী সংখ্যার আংশিক সূচী

### উপন্যাস

কোটাল—অরুণ আইন

এক দুর্ভাগ্যতাড়িত কিশোরের মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রাম।

একগুচ্ছ বিচিত্রস্বাদের গল্প

লিখছেন কিশোরপ্রিয় প্রবীণ ও নবীন লেখকরা

বিজ্ঞানের খাসমহলে

কম্পিউটরের গঠন

বিজ্ঞানী চেনো

নিকোলা টেসলা

আবিষ্কারের পদচিহ্ন

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

হাতে কলমে

বায়ুনির্দেশক যন্ত্র

ধাঁধা

শব্দচিন্তা

জানা প্রশ্ন : অজানা উত্তর

স্বাধীনতার স্বপ্নে রঙিন

শেষবার্তা / গ্রীস

ভাষা নিয়ে ভাবনা

চাই শব্দ···শব্দ চাই ( বিদ্যা )

### এছাড়াও আট পাতার সম্পূর্ণ রঙিন চিত্রকাহিনী

সূর্যসম্ভব / গায়েব-গায়েবী পর্ব

বেরোবে মে মাসের প্রথমেই

দাম : তিন টাকা

কিশোর মন-এর প্রতিটি সংখ্যাই হচ্ছে আকর্ষণীয়, আর ঝকমকে।

এখনই হকারকে বলে রাখো।
অথবা সার্কুলেশন বিভাগে লেখো।

ইত্যাদি প্রকাশনী লিঃ, কলকাতা-৭২

# কম্পিউটারের জন্মরহস্য

অশোক সেনগুপ্ত

কম্পিউটার—আজ একটি বহুল পরিচিত অতি দুর্বোধ্য শব্দ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তার জন্যে কম্পিউটারের কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। ইতিহাসের অনেকগুলো অধ্যায় পার হয়ে দেখা যায় মানব সভ্যতার ঊষা লগ্নেই মানুষ অনুভব করেছিল গণনার প্রয়োজনীয়তা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মানুষের ধীশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতার উন্নতি হয়েছে আর একই সঙ্গে গণনার পদ্ধতি আরও উন্নত হয়েছে। গণনা পদ্ধতির এই ক্রমোন্নতির পথেই কম্পিউটারের আবির্ভাব।

সভ্যতার আদিতে মানুষ গণনার কাজ চালাত দুটো হাতের দশটা আঙুলের সাহায্যে। তখন তাতেই ভালভাবে কাজ চলে যেত। ০ থেকে ৯ এই দশটা সংখ্যার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষেই আর তার প্রয়োজন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে।

এরপর এসেছিল নুড়ির ব্যবহার।

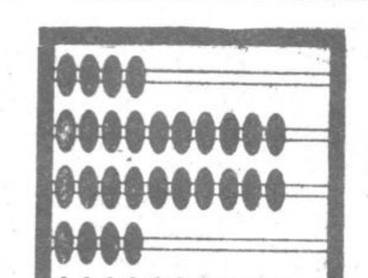

রাশিয়ার অ্যাবাকাস ঃ স্কোটি

আঙুলের বদলে ছোট ছোট নুড়ি বা পাথরের টুকরোকে মানুষ সঙ্গে রাখত গণনার হিসেবের জন্য। নুড়িকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় ক্যালকুলাস', যার থেকে এসেছে ইংরেজি 'ক্যালকুলেশন' বা গণনা শব্দটি।

প্রস্তরযুগের পণ্ডিতদের মধ্যেও ছিল আবিষ্কারের নেশা। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল এক ধরনের পুরু মাটির ফলক। তার মাঝে সমান্তরাল কয়েকটি খাঁজ কাটা থাকত। সেই খাঁজে নুড়ি রেখে গর্ত বরাবর এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে উত্তর বের করা হত। স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতি ছিল আগের থেকে আরও উন্নত এবং আয়াসসাধ্য। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষভাগে চীনদেশ, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এ ধরনের পদ্ধতির ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। একে সাধারণভাবে বলা হত অ্যাবাকাস।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আর্কিমিদিসের গ্রীসে এক ধরনের অ্যাবাকাসের ব্যবহার ছিল। গ্রীক ভাষায় 'অ্যাবাক্স' শব্দের অর্থ চ্যাপ্টা কাঠের বোর্ড বা পায়াহীন টেবিল আর হিব্রু ভাষায় 'অ্যাবাক' শব্দের অর্থ ধূলো। যন্ত্রটি ছিল খুবই সাধারণ—একটি কাঠের ট্রের ওপর কিছু কালচে বালি বা ধূলো ছড়িয়ে দিতে হত আর আঙুল বা কোন সরু কাঠি দিয়ে তার ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা হত। গ্রীস আর রোমের যুদ্ধের সময় একদিন আর্কিমিদিস গবেষণা করছিলেন তাঁর অ্যাবাকাসে। তখন তিনি নিহত হন। আর্তকণ্ঠে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'বালিতে আঁকা বৃত্তগুলো নষ্ট কর না।'

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এক ধরনের অ্যাবাকাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কয়েকটা সমান্তরাল রেখা একক, দশক, সহস্র ইত্যাদি মান নির্দেশ করত। এই যন্ত্রগণককেরোমানরা বলত 'অ্যাবাকাস' আর গ্রীকরা বলত 'অ্যাবাকিয়ন'। এই অ্যাবাকাসই যুগ যুগ ধরে প্রয়োজন আর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে। আজও যেকোন দেশের শিশু শিক্ষার একটি- অন্যতম এবং অপরিহার্য অঙ্গ—অ্যাবাকাসের মাধ্যমে গণনার পাঠ।

সপ্তদশ শতাব্দীর রোমানদের ব্যবহৃত একটি অ্যাবাকাস ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এর সঙ্গে আধুনিক জাপানী অ্যাবাকাসের মিল দেখা যায়। জাপানীরা ষোড়শ শতাব্দীতে চীনদেশ থেকে এর প্রয়োগ কৌশল শিখে নেয়। চীনারা একে বলত 'সুয়ান

পান', জাপানীরা এর নাম দিয়েছিল 'সোরে-বান', রুশরা 'স্কোটি', তুর্কীরা 'কুলবা' আর্মেনীয়রা 'ছোড়ের'।

রাশিয়ার স্কুলে, ব্যাঙ্কে, দোকানে ডেস্ক ক্যালকুলেটারের সঙ্গে কম্পিউটারও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চীনা রেস্তোরাঁ বা লন্ড্রীতেও আমরা দেখতে পাই ব্যস্ত মালিককে অভ্যস্ত হাতে 'সুয়ান পান' নিয়ে হিসেবের জটিলতা ছাড়াতে। তবে এটা ঠিক যে আধুনিকতার ঢেউ যত অগ্রগামী হয়েছে, অ্যাবাকাস তত হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির গহ্বরে।

বিবর্তনের ইতিহাসে আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা আমরা পাই ব্লেইজ পাস্কালের আবিষ্কৃত 'Toothed wheels' থেকে। ১৬৪২ সালে তাঁর এই যন্ত্র মানুষকে নতুন ধারায় ভাবতে শিখিয়েছিল। মাত্র ১৯ বছর বয়সে যোগ-বিয়োগ করার উপযোগী এই যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি অবাক করে দিয়েছিলেন সবাইকে।

পাস্কালের যন্ত্রগণক বিজ্ঞানীদের অবশ্যই ভাবিয়েছিল। পাস্কাল কেবল যোগ আর বিয়োগ করার নীতি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার যোগ করলে সেটা দিয়ে যে গুণের কাজও চালান যায়, যেমন, ৫×৪=২০ আবার ৫+৫+৫+৫=২০ অথবা ৪+৪+৪+৪+৪=২০—এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৬৭০ সালে ইংলণ্ডের জনৈক বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ স্যামুয়েল মোরল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন এক ধরনের কম্পিউটার। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিবন্ধকতার দরুন এটা খুব বেশি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

এরপর ১৬৭১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী গটফ্রিদ উইলহেল্ম লাইপনিৎ উপহার দেন এক নতুন ধরনের কম্পিউটার। 'সপ্তদশ শতাব্দীর অ্যারিস্টটল' নামে খ্যাত এই বিজ্ঞানী মাত্র ২৫ বছর বয়সে যে যন্ত্র তৈরি করেন তাতে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ও বর্গমূলের সমাধান করা যেত। ১৬৯৪ সালে একটি কার্যকরী যন্ত্রের মডেল তৈরি করে তার নাম দেওয়া হয় 'Reckoning machine'. এরও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি। এই যন্ত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল যে আধুনিক ডিজিট্যাল কম্পিউটারের মত এতেও পৌনঃপুনিক যোগের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করা যেত।

তারপর রঙ্গমঞ্চে একের পর এক দেখা যায় নানা সময়ের নানা মানের কম্পিউটার। ১৭০৯ সালে ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্শিজ গিয়োভানি পোলেনি, ১৭২৭ সালে জার্মানীর লিপজিগ শহরের জ্যাকব লিউপোল্ড এবং ১৭৩৫ সালে গিসেনের

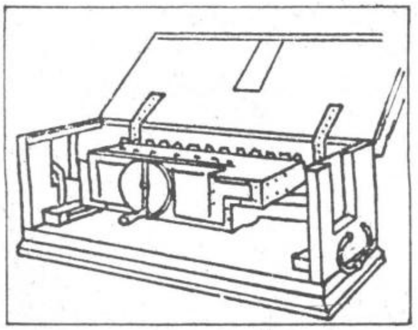

**লাইপনিৎস-এর 'রেকনিং মেশিন'-এর স্কেচ**

অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক লুডউইগ গারস্টেন বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার তৈরির চেষ্টা করেন।

১৮২০ সালে ফরাসী আবিষ্কারক চার্লস জেভিয়ার টমাস তৈরি করেন 'অ্যারিথোমিটার' নামে একটি যন্ত্র। এটি অবশ্যই পূর্ববর্তী কম্পিউটারের বিভিন্ন মডেলের থেকে অনেক উন্নত। পরবর্তী ৬০ বছরে তিনি প্রায় ১৫০০ যন্ত্র তৈরি করেন। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকেও সেই যন্ত্রের মূল নীতিকে অনুসরণ করে প্যারিসে অনেক যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

১৭৯০ সালে ফ্রান্সের জোসেফ জ্যাকার্ড একটি তাঁতের কল আবিষ্কার করেছিলেন, যেটি 'পাঞ্চকার্ড'-এর সাহায্যে চালান হত। অর্থাৎ তাঁতে বোনা কাপড়ের নক্সা কি রকম হবে তা কার্ডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হত। ঐ কল আবিষ্কারের পর ক্ষুব্ধ জনতা সেটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। বিষয়টি দূরদর্শী নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নজরে আসে এবং সরকারি সহযোগিতায় সেই আবিষ্কার স্বীকৃতি লাভ করে। ঠিক যেখানে ক্রুদ্ধ জনতা সেই তাঁতকলটি বিনষ্ট করেছিল, সেখানে আজ একটি স্মারকস্তম্ভ (monument) আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষের শুভবুদ্ধি কখনই বিজ্ঞানীর ধীশক্তিকে চিরকাল অন্ধকারে ঢেকে রাখতে দেয় না।

জোসেফ জ্যাকার্ডের পাঞ্চকার্ডের ব্যবহার উৎসাহিত করেছিল কম্পিউটারের জনক হিসেবে যিনি স্বীকৃত, সেই চার্লস ব্যাবেজকে। ১৮২২ সাল থেকে শুরু করে কম্পিউটার জগতের নিউটন হিসেবে পরিচিত এই বিজ্ঞানী তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কম্পিউটারের কাজে।

১৭৯২ সালে ইংলণ্ডের ডেভেনশায়ারে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে চার্লস ব্যাবেজ জন্মেছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা আর বহুমুখী দক্ষতার জন্য তিনি বিজ্ঞানীমহলে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এছাড়া কবিতা লেখা, পার্লামেন্টের নির্বাচন, জীবনবীমা ও ডাকবিভাগের আধুনিকীকরণের পরামর্শদান, স্পীডোমিটার ও এক বিশেষ ধরনের ডুবোজাহাজ আবিষ্কার, রকেটের ব্যবহার, সবখোল চাবি আবিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছিল। ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল। 'Life of a philosopher' বইটি তাঁরই লেখা। বইটি থেকে তাঁর সম্পর্কে এবং তৎকালীন পৃথিবীর বহু অজানা বিষয় জানা যায়।

১৮১২ সালে জন নেপিয়ারের লগারিদম-টেবিলে তিনি কিছু ভুল বের করেন। তখন থেকেই তাঁর মাথায় যন্ত্রগণক তৈরির পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকে। ১৮২২ সালে তিনি তৈরি করেন 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' ১৮৩৩ সালে আবিষ্কার করেন আরও উন্নত মানের বহু রকম গণনায় সক্ষম আর একটি যন্ত্রগণক — এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন'। দুটো যন্ত্রকেই অসম্পূর্ণ রেখে ব্যাবেজ মারা যান।

১৮৮০ সালে হলারিথ এবং পাওয়ার্স নামে দুজন বিজ্ঞানী ব্যাবেজের পাঞ্চকার্ডের কালোত্তীর্ণ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

**চার্লস ব্যাবেজ : কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মাঝে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র**

এর ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য তাঁরা একটি কারখানাও স্থাপন করেন। আজ পৃথিবীর দুটি কম্পিউটার নির্মাণকারী সংস্থা IBM (International Business Machine) এবং ICL (International Computers Limited) তাঁদেরই উত্তরসূরী।

ব্যাবেজের মৃত্যুর বহু পরে আমেরিকার অঙ্কশাস্ত্রবিদ নরবার্ট উইনার এবং মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ভ্যানেভার বুশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ব্যাবেজের মানসপুত্রের উন্নত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ১৯২৫ সালে তাঁরা

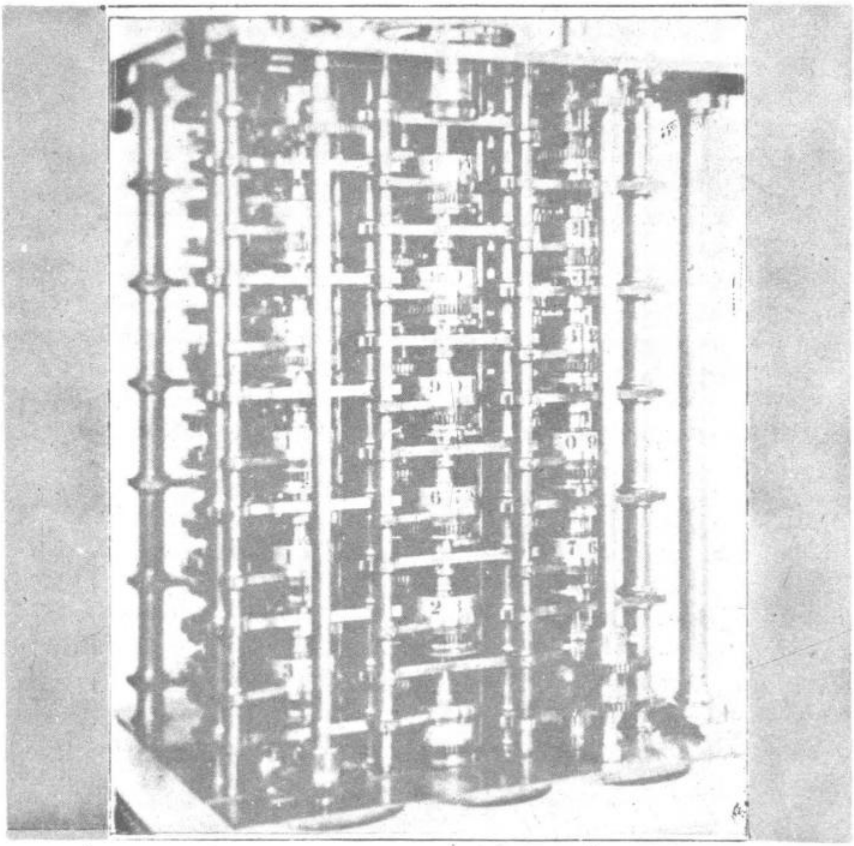

**লণ্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে রক্ষিত ব্যাবেজের কম্পিউটার**

তৈরি করেন প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটার।

১৮৮৬-৮৭ সালে উইলিয়াম সেওয়ার্ড ব্যারোজ (Burroughs) উন্নতমানের এক কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। ১৮৮৯ সালে ঐ কম্পিউটারে মুদ্রণের উপযোগিতা পাওয়া যায়। এরপর ১৯১১ সালে মনরো এবং মার্চেণ্ট-এর যন্ত্রগণক বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ১৯২০ সালে কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক মোটরের ব্যবহার হয়।

প্রথম ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার Mark-I রূপায়ণের কৃতিত্ব আমেরিকার হাভার্ডের বিজ্ঞানী H. H. Aiken-এর। ১৯৩৭ সালে IBM Corporation-এর সহযোগিতায় তিনি এটি তৈরি করেন। এই সময়েই J. W. Mauchey এবং J. P. Eckert নামে দুই যন্ত্রবিদ পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ENIAC নামে একটি কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। ENIAC কথাটা টেনে বড় করলে দাঁড়ায় Electrical Numerical Integrator And Computer. এই সময় আর একদল বিজ্ঞানী EDVAC নামে উন্নতমানের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। EDVAC কথাটার পুরো মানে হল Electronic Discrete Variable Computer. ১৯৫১ সালে এটি তার কাজ আরম্ভ করে। পঞ্চাশের দশকেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) এবং SEAC (Standard Eastern Automatic Computer) যন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কম্পিউটার সামরিকক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শব্দের বিন্যাস (code breaking) এবং ব্যালাস্টিক মিসাইল নামে উন্নত মানের ক্ষেপনাস্ত্রের প্রয়োগে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মান—এইসব উন্নত দেশগুলো এই সময়ে এধরনের যন্ত্রকে আরও কাজে লাগানর জন্যে গবেষণা শুরু করে দিয়েছিল।

১৯৪৮ সালে 'ট্রানজিস্টর' আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৯ সালে এর সাহায্যে 'সেকেণ্ড জেনারেশন' কম্পিউটার তৈরি হয়। 'ফার্স্ট' জেনারেশন'-এর ভিত্তি ছিল 'ভালব' নামে একধরনের যন্ত্রাংশ। ১৯৬২ সালের শেষে IBM-এর উদ্যোগে আরও উন্নত মানের পদ্ধতি 'সলিড স্টেট টেকনোলজি'র সাহায্যে 'থার্ড জেনারেশন' কম্পিউটার তৈরি শুরু হয়। এর পর এসেছে I.C. (Integrated Circuit) এবং CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor I.C.)-এর উন্নত মানের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

এ কথা ভেবে আমরা আনন্দ পাই যে, 'ডাটা প্রসেসিং' নিয়ে গবেষণা এই কলকাতা শহরেই প্রথম শুরু হয়েছিল Statistical Laboratory-তে। পরে এর নাম বদলে হয় Indian Statistical Institute (ISI). তিরিশের দশকে ব্রিটিশ টেবুলেটিং মেশিন (BTM) প্রতিষ্ঠানের তৈরি একধরনের যন্ত্র (ইউনিট রেকর্ড) দেশের দু-একটা জায়গায় স্থাপন করা হয়। আধুনিক কম্পিউটারের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হল, ইউনিট রেকর্ডে নির্দেশদান (কণ্ট্রোল প্রসিডিওর) করতে হত এক ধরনের বোর্ডের মধ্যে প্লাগের সাহায্যে আর কম্পিউটারে নির্দেশদান হয় 'প্রোগ্রামিং'-এর মধ্যে দিয়ে। এছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক বিশেষ ধরনের 'ম্যাগনেটিক টেপ' বা 'ডিস্ক' যেটি 'ইউনিট রেকর্ড-এ ছিল না।

তিরিশের দশকের শেষভাগে ভারতে Dunlop, Guest Keen Williams (GKW), Tata Iron & Steel Co. (TISCO), কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্মি ফ্যাক্টরী একাউণ্টস ও হিন্দুস্তান ইন্সিওরেন্স তাদের নানা কাজে ইউনিট রেকর্ডের ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৯৪৩ সাল নাগাদ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট-এ ইউনিট রেকর্ডের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৫১ সালে IBM কোম্পানীর ইউনিট রেকর্ড যন্ত্রকে ইন্সটিটিউটের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলকাতার বরাহনগরে তাঁর গবেষণা কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

১৯৫৫ সালে হলারিথ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর তৈরি HEC2M নামে কম্পিউটার প্রথম স্থাপন করা হয় কলকাতার ISI-তে। ১৯৫৮ সালে সেখানে রাশিয়ায় তৈরি URAL কম্পিউটার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সেখানে বিশাল Reyad EC 1033 এবং V-77 ছাড়াও বিজ্ঞানের নানা গবেষণার জন্য ছোটবড় নানা ধরনের কম্পিউটার রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ESSO Standard Eastern Inc. (বর্তমানে Hindustan Petroleum) ১৯৬১ সালে বোম্বাইয়ে IBM 1401 কম্পিউটার স্থাপন করে।

জওহরলাল নেহেরু মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'The future is for those who use the latest technology.' তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন, বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আমরা যদি গরুর গাড়ির গতিতে এগোবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের আরও পিছিয়ে পড়তে হবে। তাঁর প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষের কম্পিউটারের শৈশবকালকে আরও সমৃদ্ধ করতে কিছুটা সাহায্য করেছিল বৈকি! □

ভাষা নিয়ে ভাবনা

# চাই শব্দ শব্দ চাই

**'চাই শব্দ···শব্দ চাই'-এর প্রকৃত নাম 'শব্দ-সন্ধান'। কিন্তু শব্দ-সন্ধান বলতেই আমরা আজকাল এক ধরনের ধাঁধাকে বুঝি। এ কারণে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধমালার নাম দেওয়া হল 'চাই শব্দ···শব্দ চাই'।**

**আমাদের দেশে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নানা গবেষণালব্ধ তথ্য যে কিশোর কিশোরীদের হাতেও তুলে দেওয়া যায়, সেগুলি যে তাদেরও কাজে লাগতে পারে, অনুপ্রাণিত করতে পারে—আমরা সে চিন্তা থেকে দূরে থাকি। আমাদের সৌভাগ্য লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা গৌরী ধর্মপাল তাঁর চারজন সহকর্মী (ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, ডঃ কৃপাময়ী কাঞ্জিলাল, ডঃ মঞ্জুলা মিত্র এবং শ্রীমতী তৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়)-র সহযোগিতায় এমন এক গবেষণায় হাত দেন। তাঁরা পুরনো পুঁথি আর শিলালিপি ঘেঁটে তুলে আনতে চান হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলিকে। শব্দগুলি একদিকে দেবে প্রাচীন ভারতের জীবনের পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবনে শব্দগুলি ব্যবহারেরও দাবি জানাবে।**

**এমন একটা বিষয় নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগবে।**

অতীতের কত স্মরণীয় স্থাপত্য কালের স্রোতে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কত নদী পাল্টে ফেলেছে তাদের গতিপথ, ধ্বংস হয়ে গেছে কত জনপদ। আমরা সেইসব অতীত স্মৃতির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাই। ভাবি, কত সুন্দর ছিল সেইসব স্থাপত্য, নদী, জনপদ। এখন সময়ের স্রোতে তাদের কত কিই তো হারিয়ে গেছে! কিন্তু শব্দ?

কত শব্দই তো আছে—যা হাজার হাজার বছর ধরে একই বানানে, একই অর্থে, একই দ্যোতনায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে আমাদের লেখায়, আমাদের মুখের ভাষায়। যেমন দেখ এই 'মানুষ' শব্দটা। সেই ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজও পর্যন্ত কেমন ব্যবহৃত হয়ে চলেছে শব্দটি। না পরিবর্তন হয়েছে বানানের না হয়েছে অর্থের। এই 'মানুষ' শব্দটার বয়স হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। তবু এখনও কেমন, নতুন টাকার মত ঝকঝকে। ভাবতে কেমন অবাক লাগে বলতো!

এরকম কত শব্দ আছে—পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, জামাতা, সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, ব্যোম, নূতন, পূর্ব, সনাতন। এমন কি, দেখ এই 'ছি' শব্দটিও পর্যন্ত। সময়ের ধুলোর আস্তরণ ঝেড়ে ফেলে সেই কতকাল আগে থেকে আজও গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কে বানিয়েছিল এইসব শব্দ, জানা যায় না বটে—কিন্তু শব্দগুলো আছে এবং হয়তো এভাবেই থেকে যাবে।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে, বেদে, বেদাঙ্গে, জাতকে, রামায়ণে, মহাভারতে, অর্থশাস্ত্রে, নাট্যশাস্ত্রে, কাব্যে, পুরাণে—কত হাজার হাজার শব্দ লুকিয়ে আছে। কিন্তু সেই শব্দগুলো তো মরে যায়নি। আমরা ইচ্ছে করলে সেইসব শব্দকে প্রাচীন গ্রন্থের পাতা থেকে তুলে আনতে পারি। ভেঙে দিতে পারি তাদের একটানা অজ্ঞাতবাস। সেইসব শব্দ দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, লিখতে পারি। এরকম কত শব্দই তো আছে—একটু ডাকলেই তুড়িলাফ দিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। তবে আর ডাক দেবার অপেক্ষা কেন?

যেমন দেখ একটি শব্দ 'অদ্রোহশপথ'। এই প্রসঙ্গে তোমাদের জাতকের একটা গল্প বলি। একবার সাতজন রাজা মিলিতভাবে কাশীরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। কাশীরাজের এক অদ্ভুত অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি কাশীরাজের মঙ্গল-অশ্বের (খাস ঘোড়া) সাহায্যে সেই আক্রমণকারী সাতজন রাজাকে বন্দী করে কাশীরাজের কাছে আনলেন। সেই মঙ্গলাশ্বটি ছিলেন আসলে বোধিসত্ত্ব। তাঁরই পরামর্শে কাশীরাজ বন্দী সাতজন রাজাকে হত্যা করলেন না। অ-দ্রোহ-শপথ করিয়ে মুক্তি দিয়ে দিলেন। অ-দ্রোহ-শপথটি কি? সেটি হল 'আর শত্রুতা করব না'। 'দ্রোহ' শব্দটির অর্থ হল—অপকার, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এই 'দ্রোহ' শব্দটির আগে যদি একটি 'বি' বসিয়ে দাও, তাহলে দেখ আমাদের একটি অতি পরিচিত শব্দ আমরা পেয়ে গেলাম 'বিদ্রোহ'। আর 'দ্রোহ' না করার শপথটিই হল আসলে 'অদ্রোহশপথ'।

এখন পৃথিবীতে সমস্ত দেশই যুদ্ধাস্ত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। দিন দিন সমস্ত দেশই বাড়িয়ে তুলছে তাদের রণসজ্জার সম্ভার। কোন কোন দেশের পারমাণবিক শক্তির দম্ভ আমাদের এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় কি বল তো? সবাইকে একসঙ্গে নিতে হবে অদ্রোহশপথ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (লীগ অব নেশানস), জাতি-সংঘ (ইউনাইটেড নেশনস), অস্ত্রত্যাগ আন্দোলন, যুদ্ধবর্জন চুক্তি—এসবই কিন্তু ঐ অদ্রোহশপথেরই এক একটি ধাপ। তাহলে, এবার ভেবে দেখ, এই অদ্রোহশপথ শব্দটি কত ভাবে আমাদের একান্ত আপন—অথচ আমরা এই শব্দটিকেই অনেকে আদৌ চিনতাম না। তোমরা হয়ত ভাবছ—আমরা যত সভ্য এবং উন্নত হচ্ছি—ততই কি আমাদের অদ্রোহ-শপথ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে? তা কিন্তু নয়। প্রাচীন বৈদিক যুগে যখন বড় বড় যজ্ঞ করা হত, তখন যজ্ঞের আগে ঋত্বিকেরা সবাই মিলে জলস্পর্শ করে এই শপথ নিতেন। তখন অবশ্য সেই শপথকে অদ্রোহ-শপথ বলা হত না, সেই শপথকে বলা হত 'তানূনপত্র'।

এরকম এক একটি শব্দের টানে কত অতীত যে এখনও আমাদের আনাচেকানাচে লুকিয়ে আছে তার হিসেব কে বা রেখেছে! যেমন দেখ, পড়ার সময় তুমি খেলতে যেতে চাইলে মা বারণ করলেন। আর অমনি তুমি রেগে টং হয়ে গেলে। রাগ করে খেলে না, পড়লে না, খেলতেও গেলে না। তখন তোমার মেজাজ আসলে টঙে চড়ে বসে আছে। আসলে তখন তুমি কি জান যে তোমার মেজাজসহ তুমি আসলে চড়ে বসে আছ অতীত দিনের এক উঁচু ঘাটে। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে তো! আসলে অতীতে

দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় সমান—যেমন তেরো-চোদ্দ বা পনেরো-ষোল হাত খাটকে বলা হত 'টঙ্ক'। এই টঙ্ক শব্দটি কোন খাটিয়ায় চড়ে সোজা স্বর্গে চলে গেছে, না কি এখনও কোন রাজারাজড়ার চুন সুরকি খসা প্রাসাদে বহালতবিয়তে আছে আমরা জানি না। কিন্তু এই 'টঙ্ক' শব্দটি থাকুক বা না থাকুক—এখনও আছে এই 'টঙ্ক' শব্দটির সন্তান 'টং' শব্দটি। সন্তান শব্দের মূল অর্থ কি জান? অবিচ্ছিন্ন ধারা। পুত্র-কন্যা বংশধারাকে তো অবিচ্ছিন্নভাবে বহন করে চলে, তাই তো তাদের সন্তান বলা হয়। কথায় কথায় রেগে টং হয়ে যাওয়া লোককে আমাদের কারুরই ভাল লাগে না।

কিংবা ধর ঐ যে দামাল শব্দটি 'হুড়-যুদ্ধ'। তোমরা যতই মন দিয়ে পড়না কেন, পড়তে বসে একবার না একবার ভাই-বোন-দের সঙ্গে হুড়যুদ্ধ বাধাবেই। মার বকুনি অথবা বাবার শাসন পেলেই তবে সে হুড়যুদ্ধ থামে। এখন যুদ্ধ তো বোঝাই গেল, কিন্তু 'হুড়' কি, কোথা থেকে এল 'হুড়' শব্দটি।

চটপট খুলে ফেল পঞ্চতন্ত্রের পাতা। হ্যাঁ, পড়ার টেবিলে যদি না-ও থেকে থাকে, তবে 'গাঁথাঘরে' তো আছে। এই যাঃ, আবারও সমস্যা হল এই 'গাঁথাঘর' শব্দটিকে নিয়ে। খুব ভাবনায় পড়লে তো! না, না, অত ভাবনার কিছু নেই, 'গাঁথাঘর' হল আসলে গ্রন্থাগারের প্রাচীন বাংলা নাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে শব্দটির ব্যবহার আছে।

এবার শব্দটা দেখ, মিত্রভেদের চতুর্থ গল্পের ওপরে একটি শ্লোকের মধ্যে বসে আছে 'হুড়-যুদ্ধ'। হুড় মানে হল ভেড়া, আর ভেড়ায় ভেড়ায় ঢুঁ মেরে যে রক্তারক্তি কাণ্ডটা হয়, তার নামই হল হুড়যুদ্ধ। অনেক অনেক দিন আগে কোন ঠাকুমা পঞ্চতন্ত্র পড়তে পড়তে তাঁর দুর্দান্ত চার নাতিকে ঢুঁসোঢুঁসি করতে দেখে তাদের উদ্দেশ্যে 'হুড়যুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ঠাকুমা না হয়েও ঠাকুরদা, দাদু, দিদিমা, মা, বাবা, পণ্ডিতমশাই—যে কেউ হতে পারেন, তাতেই বা কি এসে যায়। যিনিই প্রথমে শব্দটি ব্যবহার করুন তাঁর উদ্যোগেই 'হুড়যুদ্ধ' পঞ্চতন্ত্রের পাতা থেকে এক তুড়িলাফে পৌঁছে গেছে আমাদের মুখের ভাষায়। ভেড়ার লড়াই থেকে অর্থ বদলে চলে এল দামাল ছেলের দাপাদাপিতে। কেমন মজার ব্যাপার না!

আবার শব্দগুলো উল্টোভাবেও রঙ বদলায়। যেমন ধর 'চাঁদা' শব্দটি। এখন চাঁদা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যেসব ঘটনা ঘটছে, সেজন্য চাঁদার কথা শুনলে ভয় করে। সহযোগের সদিচ্ছা থেকে কিন্তু এই চাঁদা

আদি অকৃত্রিম জুজু!—জুজক।
আনুমানিক খ্রি. পূ. দ্বিতীয়—খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে আঁকা অজন্তার ছবি।

প্রদানের রীতি, একথা এখন আমরা ভুলেই গেছি। সহযোগিতার থেকে সহজ কথা হল সহযোগ। এরকম দেখ, প্রতিযোগিতার থেকে সহজ হল প্রতিযোগ। (প্রতিযোগ শব্দটি ব্যবহার করেছেন রাজশেখর বসু)। আর সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা বানানের 'ই' বা 'ঈ' কার নিয়েও তোমরা অনেকেই ভুল করে ফেল। তার থেকে সহযোগ বা প্রতিযোগ-এ এই ভ্রান্তির হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। যাক সে কথা, 'চাঁদা' শব্দটির পূর্বপুরুষ 'ছন্দক' শব্দটির দিকে একবার তাকাও তোমরা। ছন্দ-ধাতুর মানে হল ভাল লাগা বা পছন্দ করা। তোমার ভাল লাগা থেকে যা দিচ্ছ বা স্বেচ্ছায় ভালবেসে যা দিচ্ছ—তাই আসলে ছন্দক বা Voluntary Contribution. কোন ভয় দেখিয়ে বা জোর করে আদায় করা নয়। যেমন ধর 'বলি'। 'বলি' হল রাজাকে প্রজার স্বেচ্ছায় দেওয়া প্রণামী। আর 'কর' হল আসলে রাজাকে প্রজার দেওয়া বাধ্যতামূলক খাজনা।

সেই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রামবাসী নগরবাসীরা চাঁদা করে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুগামীদের খাওয়াত। কেউ খাওয়াত জাউ আর আর পিঠে। কেউ চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়। যার যেমন ক্ষমতা। দুটোই তাঁরা সমান আনন্দে খেতেন। একবার তো একজন দরিদ্র লোক তাঁকে আকন্দ পাতায় মোড়া নিবন্ত-আগুনে-সেঁকা সামান্য কুণ্ডক-পূপ অর্থাৎ কুঁড়োর পিঠে খাইয়ে সেই পুণ্যের দৌলতে একদিনের মধ্যে ন কোটি সোনার টাকা পেয়ে গেল! আর একটু হলেই শঙ্খশ্রেষ্ঠী হয়ে বসেছিল আর কি! বেচারার দোষ ছিল না। সবাই ওর পুণ্যের কিছু কিছু অংশ কিনতে চাইল, ভগবানও অনুমতি দিলেন, ও কী করবে?

শঙ্খশ্রেষ্ঠী মানে কী জিগ্যেস করছ? তখনকার দিনের খুব বড়লোকদের বলা হত 'অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন' অর্থাৎ কিনা আশি কোটিপতি। অবশ্য এই আশি কোটি সংখ্যাটা সম্ভবত স্বর্ণমুদ্রার নয়, তাম্রমুদ্রার। এখন যেমন আমরা বলি ধনকুবের, millionare, billionare। ঐরকমই একজন মহাধনীকে লোকে ডাকত শঙ্খশ্রেষ্ঠী বলে। শঙ্খ হল একটি সংখ্যা—এক লক্ষ কোটি।

এই যে 'ভগবান' শব্দটি—এ-ও রং বদলেছে। আগে ভগবান মানে ছিল জ্ঞানী, বৈরাগী, যশস্বী, বীর্যবান শ্রীযুক্ত, ক্ষমতাসম্পন্ন, সিদ্ধপুরুষ। এখন 'ঠাকুর' বলতে আমরা যা বুঝি। যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রামঠাকুর, মাদারঠাকুর ইত্যাদি। পরে ভগবান মানে হয়ে গেল ঈশ্বর, God. তাঁকেও অবশ্য আমরা ঠাকুরই বলি!

এক একটি শব্দের মধ্যে আবার লুকিয়ে আছে কান্নার ইতিহাস। যেমন 'জুজু'। জাতকের একটি অতি করুণ গল্পের স্মৃতি থেকে গেছে এই আতঙ্ক শব্দটিতে।

দান-ব্রতী নির্বাসিত রাজপুত্র বিশ্বন্তর তাঁর ছেলেমেয়ে জালীকুমার ও কৃষ্ণাকে দান করে দিলেন 'জুজক' নামে এক নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণের কাছে। তারা কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল এবং লুকিয়ে রইল। কিন্তু কোথাও লুকিয়ে স্বস্তি নেই। এই বুঝি জুজক এসে ধরে—এই ভয়ে তারা চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জুজক তাদের ধরে-বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে চলল।

পরিণামে অবশ্য শিশু দুটি তাদের পিতামহের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়, জুজক মারা যায় এবং মা-বাবা ছেলে-মেয়ের পুনর্মিলন ঘটে। কিন্তু 'ঐ বুঝি জুজক এসে ধরল' এ আতঙ্ক থেকে গেছে 'জুজু' শব্দটির মধ্যে।

ভাগ্যিস বুদ্ধ—শুধু উপদেশ নয়—সেই সঙ্গে গল্পও বলেছিলেন। আর ভাগ্যিস তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সেগুলি তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে একটি, এবং একশ বছর পরে বৈশালীতে আর একটি সঙ্গীতি (মহাসভা, কনফারেন্স) ডেকে—তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে—সেগুলি সব একসঙ্গে পুঁথিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। সে সব গল্পের গায়ে লেগে রয়েছে, ভুরভুর করছে তখনকার জীবনের গন্ধ।

আর ভাগ্যিস মহামন্ত্রী কৌটিল্য শুধু চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য স্থাপনে পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সঙ্গে সম্ভবত নিজেই লিখেও ফেলেছিলেন সে রাজ্য কীভাবে রক্ষা, পালন এবং সমৃদ্ধ করতে হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। সে মূল্যবান বইটির নাম হল অর্থ-

শাস্ত্র, যার মানে রাজনীতির বই।

এইরকম আর একটি খবরের খনি হল মহামুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র। সেযুগের নাচ গান অভিনয় এবং অভিনয় সংক্রান্ত যা কিছু যেমন রঙ্গপীঠ ( স্টেজ ) কেমন হবে, কিভাবে সাজানো হবে, গায়ক বাদ্যকেরা কোথায় বসবে, কোন অভিনেতা কী গয়না-পোশাক পরবে, কীরকম রঙ মাখবে, কী ভাবে অভিনয় করবে সব খবরই জানা যায় ঐ বইটি পড়লে।

তাছাড়া ব্যাকরণের তিন পুরুষ—পাণিনি, কাত্যায়ন আর পতঞ্জলি—বিশেষ করে পাণিনি আর পতঞ্জলি হন আমাদের দুই প্রধান সংবাদদাতা। মানুষের ঘর গেরস্তালি সমাজ সংসারের কত টুকিটাকির ওপর প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন সেই বহুযুগের ওপার থেকে। নাগরিক জীবনের বিশেষজ্ঞ বাৎস্যায়নও কম নন। শহরের মানুষ কেমন বাড়িতে থাকবে, ঘরদোর,বাগান কেমন করে সাজাবে, কী খাবে, কী কী বিদ্যা শিখবে, কী খেলবে—কোন খবরটি না দিচ্ছেন ? আবার গাঁয়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বেশভূষা, আচার ব্যবহার, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি নানান টুকরো কথার সন্ধান দিচ্ছেন কবি হাল তাঁর প্রাকৃত কাব্য সত্তসঈ অর্থাৎ সপ্তশতীতে।

চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের সত্যে-কল্পনায় মেশানো খণ্ডিত বিবরণ থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আবার চন্দ্রগুপ্তের নাতি রাজা অশোকও রয়েছেন পাথরের গায় তাঁর সমকালের কিছু শব্দস্পর্শগন্ধ নিয়ে। রয়েছেন আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রবাদ-পুরুষ চরক আর সুশ্রুত তাঁদের বিপুল জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে। সবার ওপরে রয়েছে আমাদের বিশাল বৈদিক সাহিত্য।

আমাদের অতিপ্রাচীন সভ্যতার অনেক ঘুলিয়ে যাওয়া আর মুছে যাওয়া তারিখের মধ্যে একটি তারিখ কিন্তু ফুটে আছে ধ্রুব-তারার মত। সেটি হল লুম্বিনীর বাগানে মায়া-মায়ের কোলটি আলো করে যেদিন জন্ম নিলেন বুদ্ধ ভগবান। খ্রিস্টের ৬২৪ বছর আগে এই মহাজনমের লগ্নটিতে দাঁড়িয়ে যদি সামনে-পেছনে তাকাই, তাহলে পেছনে দৃষ্টি যে কতদূর চলে যাবে, তার কূলকিনারা আজো পণ্ডিতেরা করে উঠতে পারেননি। সেই অস্পষ্ট ধূসর অতীত থেকে শুরু করে ঐ জন্ম-দিনটির পরের হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত সময়সীমার মধ্যে মোটামুটি পড়েন উপরোক্ত ব্যক্তিরা—কিছু মতভেদ যদিও আছে—এবং বইগুলি তথা তাতে সংগৃহীত তথ্যগুলি। তার থেকে হাজার দুয়েক শব্দ আমরা তোমাদের কাছে ধরে দিচ্ছি। অবশ্য তার আগের বা পরের সময়ের শব্দগুলোও ভীষণ হুড়যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ উঁকি তো দেবেই।

যেমন দেখ 'সিগ্রু বা শিগ্রু' শব্দটি। আমাদের ঊর্ধ্বতন একশতম মা-ঠাকুমারাও সিগ্রু রান্না করতেন। খুব ভাবনায় পড়লে তো! না, না, ভাবনার কিছু নেই—সিগ্রু হল সজনে-ডাঁটা। আর 'অলাবু' তোমরা হয়তো অনেকেই জান লাউ। কিন্তু 'অলাবু' বলতে আলু নয়—এটা খেয়াল রাখতে হবে।

বাইরে থেকে মাল নিয়ে শহরে ঢুকলেই একটা কর দিতে হয়। তাকে বলা হয় চুঙ্গিকর ( অক্ট্রয় )। এই কর আগেকার দিনেও দিতে হত। তখন তো নগর ঘেরা থাকত পাঁচিল দিয়ে। নগরের চারদিকের পাঁচিলে থাকত চারটি দরজা। এই চারটি দরজায় শুল্ক আদায়ের জন্য কর্মচারী থাকত। আর গরীব ছাত্ররা পড়তে পারত মাইনে না দিয়ে। তাদের বলা হত 'পুণ্যশিষ্য'। বেনারসী কাপড় সেকালেও প্রসিদ্ধ ছিল। তাই ভুলভুলাইয়া ও কিছু নতুন জিনিস নয়। এর পুরনো নাম হল মোহনগৃহ—গোলোক ধাঁধার দেওয়ালে থাকত গুপ্তদ্বার।

তখনকার দিনে ফিরিওলাও ছিল এখন-কার মত। তাদের বলা হত 'কচ্ছপুটবণিক'। 'কচ্ছ' হল জলাভূমি। কচ্ছে বা জলাভূমিতে যে বেজাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়—তা দিয়ে তৈরি খোপবিশিষ্ট ঝুড়ির নামই হল কচ্ছপুট। এই খোপ খোপ ঝুড়ির বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন জিনিস রেখে যারা হাঁকতে হাঁকতে ফিরি করত তাদেরকেই বলত কচ্ছপুটবণিক।

এরকমই একজন কচ্ছপুটবণিক অর্থাৎ ফিরিওয়ালার নাম সেরিবান্। সে অন্ধপুরের রাস্তায় ফিরি করতে করতে একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করেছিল পূর্বপুরুষের লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার থালা একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে। আমরাও খুঁজছি ঐ সোনার থালা—ঘরে ঘরে জনে জনে লুকিয়ে আছে, চাপা পড়ে আছে আত্মবিস্মৃতির আবর্জনার তলায়। তাই অন্ধপুরের—অন্ধ পুর ছাড়া আর কি! বাইরে ভেতরে যা লোডশেডিং! রাস্তায় রাস্তায় হাঁকছি—চাই শব্দ… শব্দ চাই…

( ধারাবাহিক )

## আলোচিত শব্দ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. অদ্রোহ-শপথ | ৫. হুড়ুযুদ্ধ-হুড়যুদ্ধ | ৯. কর | ১৩. জৃম্ভক-জৃম্ভু | ১৭. অলাবু |
| ২. মঙ্গলাশ্ব | ৬ গাঁথাঘর | ১০. কুণ্ডক-পূপ | ১৪. সঙ্গীতি | ১৮. পুণ্যশিষ্য |
| ৩. তানূনপত্র | ৭. ছন্দক (চাঁদা) | ১১. শব্দশ্রেষ্ঠী | ১৫. রঙ্গপীঠ | ১৯. মোহনগৃহ |
| ৪. টঙ্ক | ৮. বলি | ১২. ভগবান | ১৬. সিগ্রু | ২০. কচ্ছপুটবণিক |

অকপট প্রতিশোধের কাহিনী

# পালাবদল

ধীরেন্দ্রলাল ধর

শহরের সরকারি হাসপাতাল। ডাক্তার অরুণ কুমার এখানে কয়েকমাস মাত্র এসেছেন কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এই অঞ্চলে বেশ সুনাম করে ফেলেছেন। তিনি সদাই হাসিমুখে রোগী দেখেন, রোগীর সব কথা শোনেন, রোগীর অভাব অভিযোগ কখনও উপেক্ষা করেন না। হাতে কোন কাজ না থাকলে রোগীদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করেন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেলেও অরুণ ডাক্তারের কথা রোগীদের দীর্ঘকাল মনে থাকে।

সেদিন সকালে এক রোগীর সঙ্গে অরুণ ডাক্তার গল্প করছিলেন। রোগী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনেসপেক্টর, আগে এই অঞ্চলে থানার ও সি ছিলেন। সম্প্রতি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাতের কব্জি ভেঙে গিয়েছিল। সেই ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগল না, হাড়ের মধ্যে পুঁজ জন্মাল। কনুইয়ের নিচে থেকে হাতখানি কেটে বাদ দিতে হল। হাতের সেই ঘা শুকিয়ে গেছে। আজ কমলবাবু হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরবেন। বুড়ো বয়সে ডানহাতখানি কাটা গেছে বলে তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে দুঃখ করছিলেন।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, পুলিশের কাজ করার সময় আপনি কত লোকের হাত ভেঙে দিয়েছেন। আজ তাদের সকলের অভিশাপেই বোধহয় আপনার হাতখানি গেল।

কমলবাবু বললেন, না। আমার সম্পর্কে আপনি ওই কথাটি বলতে পারবেন না। আমি জ্ঞানত কোনদিন কারও ওপর কোন অন্যায় করিনি। এই জেলাতেই তো আমি কাজ করেছি, আপনি একটু খোঁজখবর নিলেই তো জানতে পারবেন এখনও লোকে আমাকে কতটা ভালবাসে। আপনি যা বলছেন সে রকম হলে আজ আমি রায়বাহাদুর কি কমপক্ষে একটা রায়-সাহেবও হতাম। অত্যাচার ও ঘুষ—এ দুটোই আমি ঘৃণা করি।

কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ডাক্তার তা জানতেন। না হলে শুধু দারোগাগিরি করে শহরের বড় রাস্তার ওপর কেউ তিনতলা বাড়ি করতে পারে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু সে কথা তুললেন না, হেসে বললেন, একটা গল্প বলি শুনুন—এক দারোগার গল্প—

অমল আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ভাল ছেলে, বৃত্তি নিয়ে পড়তে এসেছিল শহরের কলেজে।

ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে সারা শহর জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল—ইংরাজ ভারত ছাড়ো—কুইট ইণ্ডিয়া।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। কলেজের কর্তারা কলেজ হোস্টেল বন্ধ করে দিলেন।

অমল ফিরে গেল দেশের বাড়িতে। শহরের হৈ চৈ তখনও দেশের গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়নি।

কিন্তু গ্রামেও শান্তি রইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই অবস্থা গেল বদলে। গাঁয়ের লোকেরা হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল। রাতে রাস্তায় খানা কেটে দিল যাতে সেই পথ দিয়ে মোটর না চলতে পারে। টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল, খবর পৌঁছন বন্ধ হল। রেল লাইন উপড়ে ফেলল, যাওয়া-আসায় ছেদ পড়ল। একটা রাত্রির মধ্যে গ্রামখানি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বাইশজন সিপাই নিয়ে এক দারোগা থাকতেন থানায়, ব্যাপার দেখে ভয়ে তিনি সেখান থেকে সরে পড়লেন। গাঁয়ের মানুষেরা থানার মাথায় একটা নিশান উড়িয়ে ভাবল তারা রাজ্য জয় করেছে।

কিন্তু যাতায়াতের শত বাধা সত্ত্বেও পুলিশ একদিন রাত্রে যথারীতি সেই গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল। রীতিমত ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল রাত দুপুর থেকেই। পুলিশ রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল, দোষী নির্দোষী বিচার করল না, যাকে সামনে পেলে তাকেই ঘা কতক দিলে।

পুলিশের যত রাগ স্কুল-কলেজের ছেলেদের ওপর। গাঁয়ে যত ছেলে-ছোকরা ছিল সবাইকে তারা ধরে নিয়ে এল থানায়, সেখানে তাদের ওপর ঠাণ্ডা ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হল।

অমল বেচারা নেহাৎ নিরীহ ছাত্র, সে কোন-

দিন কোন গোলমালের মধ্যে ছিল না, কিন্তু পুলিশ তাকেও বাদ দিল না। বয়স কম ও কলেজ-ছাত্র হওয়াই তার অপরাধ।

কয়েকদিন ধরে চলল শুধু নির্যাতন, আর প্রশ্ন —বল কে রাস্তায় থানা কেটেছে, টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, তাদের নাম বল? বল কি জান?

যে কিছুই জানে না, সে বলবে কি?

পুলিশের মারধোর খেয়ে মানসিক চরম অশান্তির মধ্যে ছেলে-ছোকরাদের কয়েকদিন হাজতে থেকে যেতে হল। পুলিশই তখন সব, তার ওপর আর কোন আইনকানুন নেই।

মাসখানেক পরে অমল যখন পুলিশের কবল থেকে রেহাই পেল তখন তার চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে।

বাড়ি ফিরে দেখল সেখানেও পুলিশের অনাচার কম হয়নি। একদিন পুলিশ এসে বাড়ি খানাতল্লাসি করার নামে সবকিছু তচনচ করে গেছে।

খানাতল্লাসির সময় পুলিশের আচরণে মা বিরক্তি প্রকাশ করায় পুলিশ মাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেছে। ছোট বোন তখন প্রতিবাদ করে দারোগাকে বলেছিল, আপনি তো ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি?

সেই কথায় দারোগা সেইখানেই ছোটবোনকে প্রহার করে ও তার বাঁহাতখানি মুচড়ে ভেঙে দিয়ে যায়।

তারপর সাতদিন পুলিশ কাউকে গাঁয়ের বাইরে যেতে দেয়নি। সাতদিন পরে অমলের বাবা মেয়েকে নিয়ে গেলেন সদর হাসপাতালে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে সরকারি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসার কোন সুবিধা হল না। গভর্ণমেণ্ট থেকে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ যাদের প্রহার দিয়েছে, বা পুলিশের হাতে যারা আহত হয়েছে তাদের কোনরূপ চিকিৎসা করলে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হবে।

উমাকে নিয়ে বাবা ছুটলেন শহরে। সেখানে বড় ডাক্তার সব দেখেশুনে বললেন, বড় দেরি হয়ে গেছে। হাড়ের মধ্যে পুঁজ জন্মে গেছে। অপারেশন করতে হবে।

পর পর তিনবার অস্ত্রোপচার করা হল। পুঁজ বের করে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তিন চার মাস চিকিৎসা করার পর শেষে মেয়েটার বাঁ হাতখানি কনুইয়ের নিচে থেকে কেটে ফেলতে হল।

বিবাহযোগ্যা মেয়ে। যত ভালই দেখতে হোক না কেন, একটা হাত যার নেই, তার বিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অমলের বাবা খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন।

মনোমত পাত্র পাওয়া যায় না। দু-একটা নিষ্কর্মা গাঁজাখোর জুটল বটে তারা কেউ হাজার দশেক টাকা পণের নিচে কথা বলে না। অমলের ওই একমাত্র বোন। একমাত্র মেয়ের জন্য অমলের বাবা সর্বস্বান্ত হতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু সেসব পাত্রের হাতে মেয়ে দেওয়া চলে না। শেষে বাবা কি করবেন ভেবে পেলেন না।

উমা বাপের মনঃকষ্ট বুঝল। একদিন সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ে একটি গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে সে ঝুলে পড়ল। মেয়েটা নিজেও লজ্জার হাত থেকে বাঁচল, বাপকেও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল।

তারপর দেখতে দেখতে একে একে ন'দশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে অমল ডাক্তার হয়েছে। একটি হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। সকালে নিয়মিত আউটডোরে রোগী দেখে। একদিন দেখে সেই থানার দারোগাবাবু এসেছে দেখাতে। কোথায় যেন পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে, সেই ভাঙা হাতের চিকিৎসা করতে। পুরনো মুখ, অমল দেখেই চিনল। চিকিৎসা শুরু করল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দারোগাবাবুর ভাঙা হাড়ে পুঁজ জন্মাল। হাতের যাতনা বাড়ে আর অমল একটি করে ইঞ্জেকশন দেয়। শেষ পর্যন্ত দারোগা-বাবুর হাতখানি একদিন কনুইয়ের নিচে থেকে কেটে ফেলতে হল।

অমলের মনটা এতদিনে শান্ত হল, এতদিনে বোনের ওপর যে অনাচার হয়েছিল অমল তার শোধ নিতে পেরেছে।

কমলবাবু আগাগোড়া শুনে বললেন, এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে তো বুঝলাম না।

বুঝলেন না? —অরুণ বলল, এই দারোগাটির নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন। তার নাম শ্রীকমল মিত্র।

কমলবাবু চমকে উঠল, মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ লাল করে বলল, তুমি—তুমি—আমি তোমার নামে নালিশ করব, মেডিক্যাল বোর্ডকে জানিয়ে তোমার ডিগ্রী কেড়ে নেব—

অরুণ বলল, কিছুই করতে পারবেন না। আপনি যেমন আইনমাফিক আমার বোনের হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি আইন বাঁচিয়ে আপনার হাত কেটে দিয়েছি। আমার প্রেসক্রিপশন সব ঠিক আছে, হসপিটালের রেকর্ড ঠিক আছে।

ঠক, খুনী শয়তান—

শয়তানিতে আপনি আমার গুরু। এখনও পুরোপুরি আপনার শিষ্য হতে পারিনি। আপনার মত ঘুষ নেওয়াটা এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি।

শয়তান, আমি দেখে নেব।

ভুলে যাবেন না যে আপনি এখন আর দারোগা নন, তাছাড়া দেশে এখন সে ব্রিটিশ রাজত্ব আর নেই। আপনার এখন কিছুই করার নেই, আর যাই করুন কাটা হাতখানা কিছুতেই জোড়া লাগবে না। বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এখন ওই ক্ষতের উপর হাত বুলানগে, আমার বোনের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

কমলবাবু গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গেল।

ছবি : ধ্রুব রায়

## বেচাকেনা

### মৃণালকান্তি দাশ

"শুনলাম কেনা দামে
দিচ্ছেন ক্যামেরা—
তাই বুঝি কিউ দেয়
যদু, মধু, শ্যামেরা?
কিন্তু একটা কথা
দয়া করে বলে দিন—
লোকসানে ব্যবসাটা
চালাবেন কতদিন?"

"কিছুমিছু লাভ রাখা
ব্যবসার শর্ত,
আমি ছাড়া কেউ হলে
সেইটাই করত।
ক্যামেরা খারাপ হলে
ক্রেতাকে তো বারবার,
এখানে আসতে হবে
প্রতি মাসে চার বার।
তখনই তো লাভ হবে—
এই ভেবে ক্যামেরা
কেনা দামে বেচি, কেনে
যদু, মধু, শ্যামেরা।"

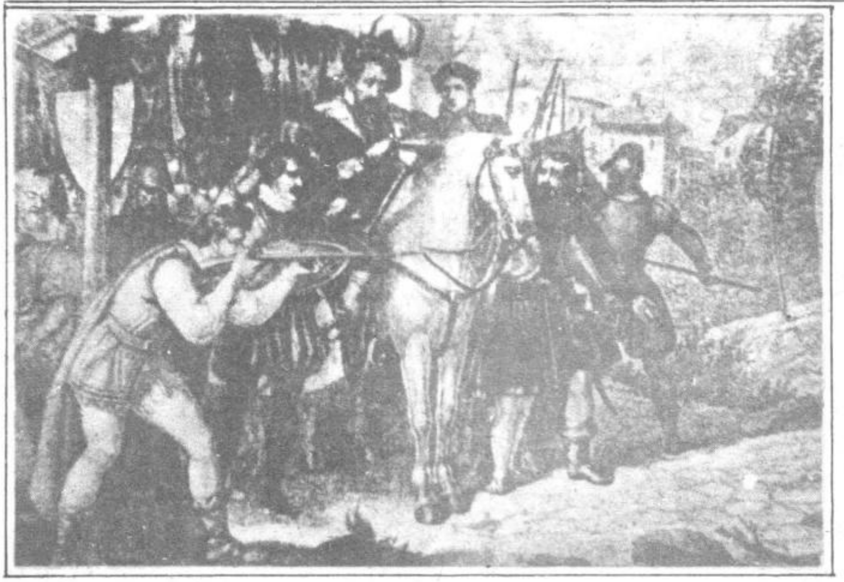

# লক্ষ্যভেদ

## নারায়ণচন্দ্র চন্দ

সুইজারল্যাণ্ডের ছবির মত সুন্দর শহর আলটডর্ফ। তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সুশ্রী পাইন প্রকৃতির সৈনিকের মত সারে সারে সোজা দাঁড়িয়ে। একদিকে টলটলে জলের হ্রদ। প্রভাতের সোনালি রোদে আল্‌পসের তুষারমাথা চূড়া সোনার গির্জাশীর্ষের মত আকাশে জেগে থাকে। তার ছবি আঁকা হয় হ্রদের জলে।

একদিন ঐ উদ্যান পথ দিয়ে এক তরুণ হেঁটে চলেছে, সঙ্গে আটবছরের ছেলে। ছেলের কাঁধে থলিতে ছোট ভাইয়ের জন্য কেনা কাঠের খেলনা, চকোলেট, আপেল। তরুণের পিঠে ঝোলান ধনুক ও তূণ। পরনে রোমান সৈনিকের মত কোমরঝুল জামা, পায়ে মোজার পট্টি, ভারি চপ্পল। পথে দেখা হয় যাদের সঙ্গে তাদের অনেকেই তাকে চেনে, কাছে আসে, খুশি হয়। কুশল প্রশ্ন করে। কয়েকটি কিশোর এসে অভিবাদন করে। বলে—মাস্টার, ভাল আছেন?

কিশোররা শিক্ষাগুরুকে 'মাস্টার' বলে সম্বোধন করে। তারা জানে, উইলিয়ম টেল সুইজারল্যাণ্ডের সেরা তীরন্দাজ। তার মত এমন নিশানার লোক সারা ইউরোপেও আছে কিনা সন্দেহ। উইলিয়মকে দেখে পথে বেশ ভিড় জমে যায়। এমন সময় উইলিয়মের কাঁধে কে যেন হাত রেখে কাছে এসে দাঁড়াল। এ হাতের স্পর্শ বন্ধুর হাতের মত কোমল, আদরমাখা নয়; ভারি এবং শক্ত। উইলিয়ম মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চায়, কে! দেখে, পরিচিত কেউ নয়, তার মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে বল্লম। সৈনিক। দেখে, একজন নয়, কয়েকজন এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। বিস্মিত উইলিয়ম বলে—কি ব্যাপার? কি চাও তোমরা?

সৈনিক তার কাঁধে হাত রেখেই বলে—তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

উইলিয়মের নির্ভীক প্রশ্ন—গ্রেপ্তার! কেন, কি অপরাধে?

উইলিয়মের পরিচিত একজন বলে—পিছনে স্কোয়ারের মধ্যে ঐ খুঁটিটা দেখ।

উইলিয়ম চেয়ে দেখে বলল—হ্যাঁ, একটা খুঁটি দেখছি। তাতে কি?

—খুঁটির মাথায় একটা টুপি দেখেছ?

উইলিয়ম আবার তাকিয়ে দেখে উত্তর করল—হ্যাঁ, একটি টুপি। সৈনিকের টুপির মতন।

—ওটা অস্ট্রিয়ান গভর্ণরের প্রতিনিধি। অস্ট্রিয়ানরা আমাদের দেশের মালিক তো। তাই গভর্ণরের নির্দেশ, এই স্কোয়ার দিয়ে চলার সময় প্রতি ব্যক্তিকে নতজানু হয়ে সেলাম জানাতে হবে। এ হুকুম অমান্য করলে শাস্তি প্রাণদণ্ড।

এই সময় সৈনিকেরা জুতো দিয়ে খট খট শব্দ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন পথচারী বলল—ঐ তো গভর্ণর গেসলার নিজেই এসেছেন।

উইলিয়ম পাশে চেয়ে দেখে ঘোড়ার পিঠে এক কর্তাব্যক্তি, মাথায় নক্সাকাটা রঙিন পাগড়ির মত টুপি, গায়ে পশমের বড় কোট, কোমরে তরবারি। উইলিয়ম এক নজরে দেখে নিয়ে বলল—আপনি অস্ট্রিয়ান গভর্ণর গেসলার?

—ইয়াজ, গেসলারের ভারি গলার উত্তর।

উইলিয়ম বলে—এ কি অন্যায়, মিঃ গভর্ণর। আপনার সৈন্যরা বিনা কারণে আমাকে আটক করতে চাইছে।

—বিনা কারণে নয়।

উইলিয়ম উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—নিশ্চয়ই বিনা কারণে। আমি আপনার ঐ খুঁটি দেখিনি। খুঁটির মাথায় টুপি, না কাকের বাসা কি আছে তাও লক্ষ্য করিনি। আপনার কী নির্দেশ, কী কানুন কিছুই জানিনে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

গেসলার বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে। টুপিকে কাকের বাসা বলায় তার মর্যাদায় আঘাত লেগেছে কিন্তু ক্রোধ চেপে রেখে বিচারকের ভঙ্গিতে বলে—উইলিয়ম টেল, সব অপরাধীই বলে 'আমি নির্দোষ, আমি আইন জানতাম না।' আইনের কাছে অজ্ঞতা কোন অজুহাত নয়। তুমি অপরাধী।

এই কথা বলে থামতেই তার চোখের ইঙ্গিত পেয়ে সৈন্যরা উইলিয়মকে বেঁধে ফেলল। উইলিয়ম চেয়ে দেখে গেসলারের ছোট দুটি চোখ সাপের চোখের মত পলকহীন-ভাবে তার ওপর নিবদ্ধ। অকস্মাৎ গেসলারের মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। বলল—উইলিয়ম টেল, তুমি অপরাধী নিশ্চিত, তবে তুমি একটা পরীক্ষা দিতে রাজি থাকলে তোমায় মুক্তি দিতে পারি। চোখে তার মিটিমিটি হাসি।

কী পরীক্ষা? টেল জিজ্ঞেস করে।

—তুমি নাকি সুইজারল্যাণ্ডের সব চাইতে বড় ধনুকধারী। তোমার সঙ্গে ওটি কে? তোমার ছেলে?

—আমার ছেলে চার্লস।

—বেশ। তোমার ওস্তাদির পরীক্ষা হবে। তোমার ছেলের মাথায়-রাখা আপেল দেড়শো কদম দূর থেকে তীর দিয়ে বিঁধবে, এই ছোট্ট পরীক্ষা।

উইলিয়ম মুহূর্তে ঘাড় সোজা করে গেসলারের মুখের দিকে চাইল। তার স্পষ্ট কথা—এ অসম্ভব। ছেলের জীবন নিয়ে ধনুকের খেলা! আপনি কী চান?

গেসলার সিংহকে ফাঁদে ফেলেছে। গোঁফের ফাঁকে কুটিল হাসি।

উইলিয়ম মাথা নিচু করে ক্রোধ দমন করার চেষ্টা করে। এই সময় চার্লস তার কাঁধের থলিটি মাটিতে নামিয়ে তা থেকে একটা লাল টুকটুকে আপেল নিয়ে উইলিয়মের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—বাবা, ঠিক আছে।

তুমি তো আপেলের চাইতে ছোট জিনিস অনেক দূর থেকেই তীর দিয়ে গেঁথে দিয়েছ, অনেকবার। তুমি পরীক্ষা দাও, আমি ঠিক থাকব।

এই কথা কয়টি বলে বালক দৌড়ে কিছুটা দূরে এক পাইনগাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দূরত্ব দেড়শো কদমের বেশি ছাড়া কম নয়। আপেলটি মাথার ওপর ঠিকমত বসিয়ে, দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে ক্ষুদে বীরের ভঙ্গিতে বাবার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল—আমি রেডি।

বালকের নাটকীয় আচরণে জনতা হতভম্ব। একজন বলে উঠল—বাপরে! এ যে বাঘের বাচ্চা!

ছেলের আত্মবিশ্বাস আর সাহস দেখে উইলিয়ম মনে মনে খুশি হল কিন্তু ভুলের পরিণতি কি হতে পারে চিন্তা করে কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। গেসলারের বিদ্রূপ মাখা কথা কানে এল—বাপের চেয়ে ছেলেই দেখছি বেশি সাহসী ভীরু তীরন্দাজের সাহসী পুত্র!

উইলিয়ম মন স্থির করে ফেলেছে। বলল—বাঁধন খুলে দাও। তারপর ধনুক হাতে নিয়ে ছিলাটা ভাল করে দেখে নিল। তূণ থেকে দুটি তীর বেছে নিল। একটি রাখল বুকের ওপরকার জ্যাকেটের নিচে অন্যটি হাতে নিয়ে গেসলারের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। গেসলারের ওপর নয় তার ঘোড়ার পা থেকে গদির রেকাবি—গেসলারের ঊরু—কোমর, গলা—ঐ পর্যন্তই। শয়তানের চোখের দিকে চেয়ে উত্তেজনা বাড়াতে ইচ্ছা হল না তার।

তারপর তীরটি সন্তর্পণে ধনুতে স্থাপন করল, খানিক চেয়ে থেকে দূরত্বটা অনুমান করে নিল। আকাশের দিকে চেয়ে বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করল, সামনের দিকে কিঞ্চিৎ হেলে ধনুকের গুণ কান পর্যন্ত টেনে নিল। জনতা স্তব্ধ, কোথাও সামান্যতম শব্দ নেই। অনেকের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে।

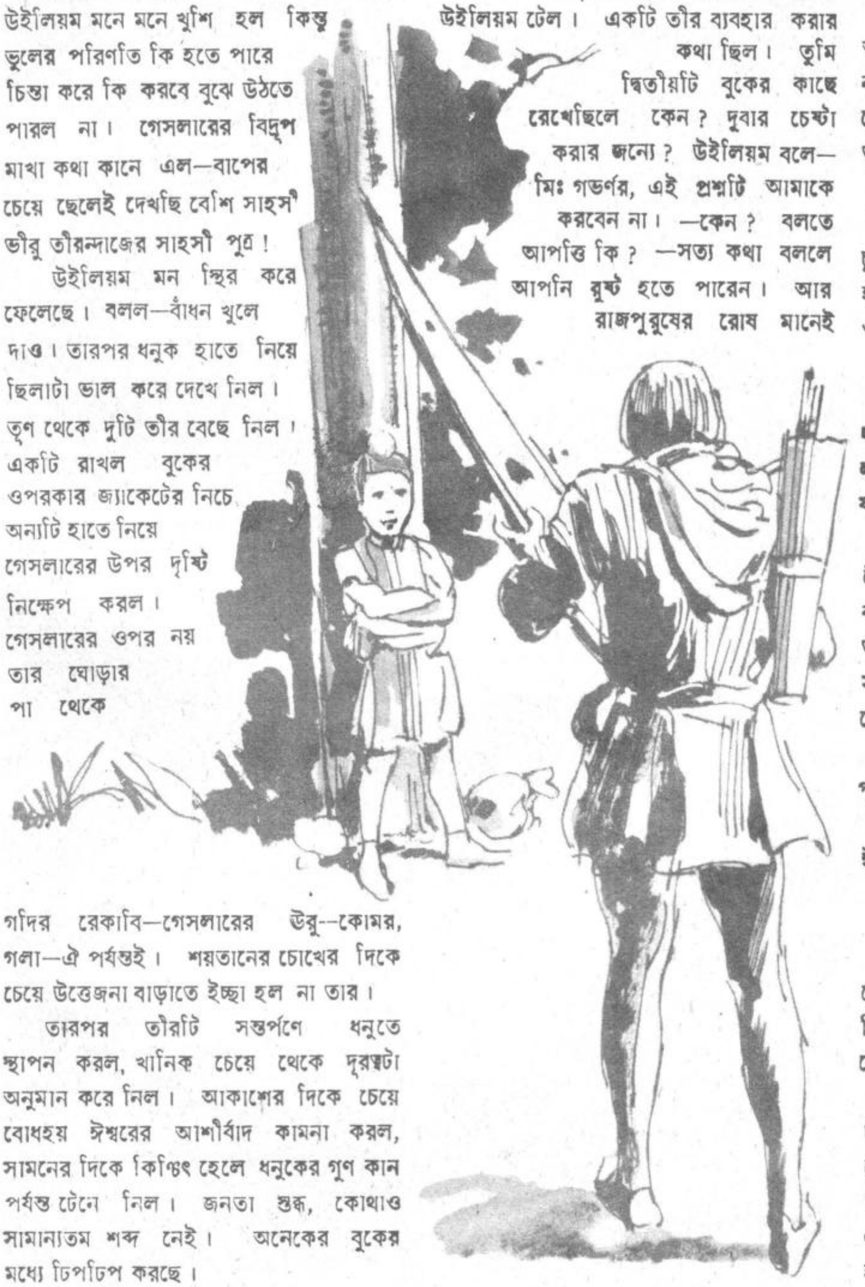

এমনি কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর জনতার সমস্বর চিৎকার—সাবাস! সাবাস!

তীরটি চার্লসের পিছনের গাছের কাণ্ডে সোজা বিঁধে রয়েছে, আপেলটি দু টুকরো হয়ে দু দিকে ছিটকে পড়েছে। চার্লস আপেলের খণ্ড দুটি কুড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। উইলিয়ম তাকে দু হাতে শূন্যে তুলে ধরল, বলল—সাবাস বেটা। তুমি পারবে।

জনতার কেউ কেউ এসে চার্লসকে কাঁধে তুলে নিল। তাদের আনন্দ আর ধরে না।

গেসলার বিস্মিত হয়েছে। সত্যি, উইলিয়ম টেল বাহাদুর বটে। তার চোখে পড়ল উইলিয়মের জ্যাকেটের নিচে রাখা তীরটি। কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করে—উইলিয়ম টেল। একটি তীর ব্যবহার করার কথা ছিল। তুমি দ্বিতীয়টি বুকের কাছে রেখেছিলে কেন? দুবার চেষ্টা করার জন্যে? উইলিয়ম বলে—মিঃ গভর্ণর, এই প্রশ্নটি আমাকে করবেন না। —কেন? বলতে আপত্তি কি? —সত্য কথা বললে আপনি রুষ্ট হতে পারেন। আর রাজপুরুষের রোষ মানেই মৃত্যু।

—না, তেমন শংকা নেই। কথা দিচ্ছি, সত্য বল, তোমার প্রাণের ভয় নেই।

গেসলারের চোখের দিকে চেয়ে উইলিয়ম বলে—প্রথম তীরে আমার ছেলের প্রাণ গেলে দ্বিতীয়টি আপনার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করত।

গেসলার গর্জন করে উঠল—ও দানব! এই ছিল তোমার মতলব! সৈন্যগণ, আটকাও ওকে, দৈত্যকে বিশ্বাস নেই।

সৈন্যরা যখন উইলিয়মকে ঘিরে ধরে বাঁধছে, সে চেঁচিয়ে বলল—গভর্ণর, আপনি সত্য ভঙ্গ করছেন। কথা দিয়েছিলেন, আমার প্রাণের হানি হবে না। আপনার কথার মূল্য কানাকড়িও না। এই রকম রাজপ্রতিনিধি আপনি?

গেসলার উত্তর দেয় উইলিয়ম টেল, আমার কথা ঠিক আছে। তোমার প্রাণ নেব না, সারাজীবন তুমি অন্ধকার কারাকক্ষে তোমার প্রিয় জীবন নিয়ে খেলা করে কাটাবে। তাহলে ত সত্যরক্ষা হল?

সৈন্যদের প্রতি আদেশ হল—নিয়ে চল।

দুইজন সৈনিক গেসলারের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলে—হুজুর, ঐ দৈত্যকে পাহাড়ী হাঁটা পথে নিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ হবে? ওকে বিশ্বাস কি?

—কি করতে চাও?

—নৌকাতে হ্রদটা পার হয়ে সোজা পথ ধরলে হেড কোয়ার্টারে যেতে সময় কম লাগবে। ওকে নিজের কব্জার মধ্যে রাখাও যাবে।

—বেশ তাই কর, নৌকায় তোল ওকে।

সৈন্যদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে উইলিয়ম পুত্রকে বলে—চার্লস, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। ছোট ভাইটিকে ভালবেসো, ওকে খেলনা দিও সাহসী হয়ে ওঠা চাই। মার্টেল কাকা যোসেফ কাকা এদের সাহায্য নিয়ো।

—তোমার কি হবে, বাবা? উৎকণ্ঠিত পুত্রের প্রশ্ন।

—আমার জন্যে চিন্তা করো না, চার্লস। ঈশ্বর আছেন, দেখি কি হয়।

## নৌকাপথে

হাত-পা বেঁধে উইলিয়মকে নৌকার খোলের মধ্যে বসিয়ে সৈন্যরা নৌকা ছেড়ে দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল সবাই।

হঠাৎ নৌকাটা দমকা বাতাসে টলমল করে উঠে ঘুরে গেল। কি হচ্ছে দেখার জন্য বাইরে তাকিয়ে দেখে অ্যাকসেল-স্টাইন পাহাড়ের যে অংশটা হ্রদের মধ্যে এগিয়ে এসেছে তার বাঁক ঘুরতেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে পড়েছে নৌকা। পাহাড়-ঘেরা

হ্রদের মধ্যে বাতাস ঢুকে পড়লে তা ঘুরপাক খেতে খেতে ঘূর্ণির মত প্রবল হয়ে ওঠে। এই ঘূর্ণিঝড়ের মুখে নৌকা সামাল দিতে সৈনিকেরা হিমসিম খাচ্ছে। উইলিয়ম মনে মনে খুশি হয়—ডাঙার দেশের ব্যাটারা নৌকা চালাও। দেখি কত হিম্মত।

নাঃ। পারছে না। নৌকা যদি ডোবে, সৈনিক ও গেসলারের সঙ্গে তাকে ডুবতে হবে। হাত-পা খোলা থাকলে সে সাঁতরিয়ে হ্রদ পার হয়ে যেতে পারত। এই ঝড়ের মধ্যে সে ঝাঁপ দিয়ে কূলে চলে যেত। কিন্তু তার ভাগ্য যে ঐ শয়তানের জীবনের সঙ্গে বাঁধা।

সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করতে লাগল। কয়েকজন গিয়ে গেসলারকে বলে--স্যার, বিপদ হল তো! নৌকা সামলানো যাচ্ছে না, কি হবে বলা মুস্কিল। আমরা বলি কি, ঐ ডাকাতটাকে বাঁধন খুলে হাল ধরার কাজে লাগাই। জলের দেশের লোক, ও ঠিক কূলে নিয়ে যেতে পারবে।

গেসলার প্রথমে উইলিয়মকে মুক্ত করে দিতে রাজি হয় না। অবশেষে বেগতিক দেখে প্রাণের ভয়ে সৈনিকদের কথায় সম্মত হল। বাঁধনমুক্ত উইলিয়ম গিয়ে শক্ত হাতে নৌকার হাল ধরে।

কিছুক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে উইলিয়ম নৌকাটিকে কতকটা বাগে এনেছে। পাহাড়ের একটা অংশ হ্রদের দিকে খানিকটা এসে কচ্ছপের পিঠের মত জেগে আছে। তার পাশ দিয়ে নৌকা চালানর সময় উইলিয়ম তীর ভরতি চামড়ার তূণ আর ধনুকখানা তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে পাথরের ওপর গিয়ে উঠল, হাল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা টাল খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কূল ছেড়ে হ্রদের ভিতর দিকে ধেয়ে চলল। টলমল করতে করতে নৌকা মাঝ-হ্রদের দিকে চলে গেল। উইলিয়ম অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ধনুক হাতে। ক্রমে ঝড়ের বেগ কমে এল। পাহাড়ী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় যেমন অকস্মাৎ আসে, তেমনি খানিক পরেই পাহাড়ের গা বেয়ে ওপর দিকে উঠে যায়। উইলিয়ম দেখল ঐ দূরে নৌকাটি ঘুরিয়ে সৈনিকেরা উত্তর পাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

উইলিয়মের পরিবারের জন্য উদ্বেগ কমেছে কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা কিছুমাত্র কমেনি। সে ভাবল, সৈনিকেরা গেসলারকে নিয়ে উত্তর দিকের গিরিপথ দিয়ে হেড-কোয়ার্টারের দিকে যাবে। ঐখানে ওদের কায়দায় পাব।

পাহাড়ের সব পথ তার নখদর্পণে। ধনুক থেকে তীরটা খুলে তূণে ভরে নিয়ে সে কচ্ছপের আধা-ডোবা পাথরখণ্ড থেকে পাহাড়ের ওপরদিকে উঠে গেল।

## শিকারের প্রতীক্ষায়

পাহাড়ের ঢালে পাইনগাছ। বহুদিন ধরে ঝিহিকাঁটার মত পাতাগুলো গাছের তলায় জমে পুরু গালিচা তৈরি হয়েছে। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে আরাম, নিচের দিক থেকে স্প্রিং-এর মত মৃদু দোলা দেয়। খানিক হাঁটলে মন শান্ত হয়ে আসে। উইলিয়ম গাছের ফাঁক দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল, চোখ রয়েছে হ্রদের দিকে, নৌকা কতদূর গেল তার প্রতি লক্ষ্য। অবশেষে সে গিরিপথের কাছে গিয়ে পৌঁছল। নৌকা থেকে নেমে সৈনিকেরা আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ঐ পথ দিয়েই এগিয়ে আসবে। উইলিয়ম এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখান থেকে সে গিরিপথের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে কিন্তু বাঁকে পাথরের আড়াল থাকায় তাকে নজরে পড়বে না।

উইলিয়ম খানিক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দূরে স্কুলের ঘণ্টা বাজার মত ঢং করে একটা আওয়াজ হল। হরিণের ডাক। কোথাও ভয়ের কিছু দেখেছে, তাই অন্যদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। খানিক পরে উইলিয়মের কানে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। পাহাড়ের নিচের দিক হেকে আসছে ঐ শব্দ। সোজা হয়ে বসে সে বুঝতে চেষ্টা করল, কিসের শব্দ। বুঝতে পারল, গেসলারের দল কথা বলতে বলতে গিরিপথ দিয়ে আসছে। সংকীর্ণ পথ। একজনের পিছে একজন এইভাবে চলতে পারে। দুই পাশে খাড়া দেওয়ালের মত পাহাড়। উইলিয়ম এবার স্বর্ণঈগলের মত শিকারের দিকে নজর রাখছে। একটা হেলান পাথরের স্তূপ ঘুরতেই তাদের দেখা গেল। সবার আগে গেসলার, উত্তেজিতভাবে সৈনিকদের কাছে নির্দেশ জারি করছে—ঐ ডেভিলকে উচিত শিক্ষা দেব আমি। ও আমাদের হ্রদের জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। ওকেই খতম করব, ওর বংশসুদ্ধ সব্বাইকে। আগে ওকে আর বউকে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখে, ওদের সামনেই ওদের ছেলে বাচ্চা শয়তানটার গলা কে--

'টে' কথাটি উচ্চারিত হওয়ার আগেই একটি তীর সাঁ করে তার গলার নলি কেটে ফেলে ওপাশে পাথরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। গেসলারের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর। হতবাক সৈনিকেরা ওপর দিকে চেয়ে দেখে উইলিয়ম টেল মূর্তিমান যমের মত, হাতে ধনুক তাতে আর একটা তীর যোজনা করা হয়েছে।

উইলিয়ম চেঁচিয়ে বলে—অস্ত্র ফেলে দাও। মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। নড়লেই প্রাণ যাবে।

ভীত সৈনিকেরা বর্শা, তরবারি যার যা ছিল পথের ওপর ফেলে দিয়ে দু হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল। তারা দেখেছিল, পালানর পথ নেই, পিছিয়ে গেলে হ্রদে আশ্রয় মিলবে না। সামনের দিকে যেতে উইলিয়মের তীরের তলা দিয়ে যেতে হবে যে!

উইলিয়ম বিজয়গর্বে চিৎকার করে বলল —বিদেশী কাপুরুষেরা। ঐ মিথ্যাবাদী গভর্ণরের নোংরা লাশটা তুলে নিয়ে যাও। তোমাদের রেহাই দিলাম। আমরা কেউ ঐ দেহ স্পর্শ করব না। আর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে তোমাদের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এদেশ ছেড়ে পালাও। নইলে সবার অবস্থা হবে গেসলারের মত।

সৈনিকেরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারা বোধহয় উইলিয়মের কথা ভাল বুঝতে পারেনি। কিংবা কি করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি।

উইলিময় এবার হুকুম দিল—লাশ তোল, অন্যেরা হাত তুলে চলে যাও। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি।

এবার সৈন্যদের চমক ভাঙল। কয়েকজনে মিলে গেসলারের ভারি মৃত দেহ কাঁধে তুলে নিল, অন্যেরা তার পিছে পিছে চলতে লাগল, নীরবে মাথার ওপর হাত তুলে। ওরা পথের বাঁক ঘুরে আড়ালে চলে গেলে উইলিয়ম সোজাপথে গ্রামের দিকে দ্রুত চলতে লাগল। প্রথমে যে গ্রামে পৌঁছল, সবাইকে ডেকে বলল—গেসলার খতম, এবার সবাই রুখে ওঠ, বিদেশীদের তাড়াও আমাদের দেশ থেকে।

উইলিয়মের কাছে কাহিনী শুনে খুশিতে ডগমগ লোকেরা গির্জায় গিয়ে জোরে জোরে ঘণ্টাধ্বনি করতে লাগল। উঁচু টিলার ওপর আগুন জ্বালিয়ে আশেপাশে গ্রামের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ক্রমে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়লে শুরু হল বিদ্রোহ। অস্ট্রিয়ান সৈন্য ও শাসকদল সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হল। উইলিয়ম টেল হল জাতীয় বীর, ঘরে ঘরে তার জয়গান।

উইলিয়ম হ্রদের যেখানটায় গেসলারের নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমেছিল সেটি এখনও 'টেলের টিলা (Tell's Platte) বলে পরিচিত। সেখানে স্থাপিত হয়েছে এক গির্জা। এছাড়া আলটডর্ফ শহরে উইলিয়ম টেলের এক বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঠিক যেখানটায় সে তার ছেলের মাথায় রাখা আপেল লক্ষ্যভেদ করেছিল।

উইলিয়ম টেল সুইজারল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে সবচেয়ে পরিচিত, সবচেয়ে প্রিয় নাম। সাড়ে ছশো বছর আগেকার বীরত্বের ঘটনাকে লোকেরা মনে করে এই সেদিনের কাহিনী।□

হালকা হাসির মজার কথা

# চালাকির দবারা

## পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শুকদেবের ওই একটিমাত্র দোষ- সব শেষে যে বইটা পড়েছে, সেই বই-এর যে কথাটা তার মনে ধরেছে সেটা নিয়েই সে বেশ কিছুদিন মেতে থাকে। যতক্ষণ না সে আর একটা বই পড়ছে ততক্ষণ কিছুতেই আগের বই-এর কথা তার মন থেকে মোছে না। আসলে ওর মনটা হচ্ছে টেপ রেকরডারের মত। যতক্ষণ না টেপের ওপর আর একটা রেকরড হবে ততক্ষণ আগের রেকরডটা বাজতেই থাকবে।

কিন্তু আর একটা বই তাকে পড়ানোই মুশকিল। একটা বই-এর আপ্তবাক্য ভোলাবার জন্য তাকে আর একটা বই দিয়ে দেখেছি সে ফেলে রেখে দিয়েছে। অথচ কারও হাতে কোন বই দেখলে তার নেওয়া চাই। এই তো সেদিন আমার বাড়ি এসে যাদব চক্রবর্তীর পাটিগণিতটাই হাতের কাছে পেয়ে নিয়ে গেল। আমি বললাম, শুকদেব, এ বই নিয়ে তুমি কি করবে? বড় ট্র্যাজিক বই, বড় কষ্ট। স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন।

শুকদেব মলাট দেওয়া বইটি উল্টেও দেখেনি। হাতেই নিয়েই ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। শুধু যাবার সময় বলেছে, এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি হাঁদু।

আমি বলি, এই বইটাই নিলে শেষ পর্যন্ত, এই করুণ বিয়োগান্ত বইটা সারা জীবন আমায় কাঁদিয়েছে।

শুকদেব বলল, তাহলে তো আমাকেও পড়তে হবে ভাই। কান্নার বই মাঝে মাঝে দরকার। কাঁদলে লিভার ও পিলে দুটোই ভাল থাকে। তাছাড়া তরল মন বেশ ঘন হয়। চোখেরও এক্সট্রা এক্সারসাইজ হয়। জান না, চাণক্য মুরাকে কী বলেছিল? কাঁদো নারী কাঁদো!

ভুলেই গিয়েছিলাম শুকদেব কদিন আগে আমাদের অফিস ক্লাবের চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখে এসেছে। এর আগে চন্দ্রগুপ্ত থেকে বার আস্টেক কোট করেছে শুকদেব গত দশদিন ধরে।

শুকদেবের পরিচয়টা দিতে ভুলে গিয়েছি। সে আমাদের দৈনিক গোপনবার্তা কাগজের রিপোরটার। আমার সহকর্মী।

আমাদের চিফ রিপোরটার কানুদা গাড়ি করে বাড়ি ফিরছেন। আমি ও শুকদেব হেঁটে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। শুকদেব বলছে, হাঁদু এইভাবে যেন আমরা চিরদিন একসঙ্গে পায়ে হেঁটে পথ চলতে পারি। আমাদের গাড়ি নেই বলে কোন দুঃখ নেই। যেন পা গাড়িটা কখনও খারাপ না হয়।

এমন সময় কানুদার গাড়ি সামনে ব্রেক কষল। কানুদা শ্যামবাজার থাকেন, শুকদেব থাকে সিঁথিতে। আমি থাকি দক্ষিণ কলকাতায়। কানুদা জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ও শুকদেব, বাড়ি যাবা, নাকি? গাড়িতে উঠে পড়।

শুকদেব সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'সম্রাট মহানুভব'। এই বলে খোলা দরজা দিয়ে তড়াক করে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

আর একদিন, ডাক্তারদের এক প্রেস কনফারেনস প্রেস ক্লাবে। একজন ডাক্তারবাবু যখন বলছিলেন কলকাতার অমুক হাসপাতালে এক নতুন ধরনের আবিষ্কার হয়েছে। হনুমানের লেজের থেকে সিরাম নিয়ে ইনজেকশন করে আগুনে পোড়া রোগীকে সারিয়ে তোলা হচ্ছে। আসলে লঙ্কাকাণ্ডের সময় হনুমানের লেজ যে পোড়েনি, তার কারণ হনুমানের লেজে এক বিশেষ রকমের রাসায়নিক পদার্থ আছে যা আগুনকে প্রতিরোধ করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শুনে শুকদেব বলে উঠল, কাত্যায়ন তুমি নাড়ি দেখতে জানো? দেখতো আমি বেঁচে আছি কিনা।

গোটা প্রেস কনফারেনস এরপর ভেস্তে যাওয়ার মত।

কিছুদিন আগে শুকদেবের বাড়ি গিয়েছিলাম। যাদব চক্রবর্তীর বইটি ফেরৎ নিয়ে আসব। আমার ভাগ্নীর বই ওটি। তাকে দিয়ে দিতে হবে। গিয়ে দেখি পাটিগণিত দিয়ে জলের কুঁজো ঢাকা দিয়েছে শুকদেব।

আমি বললাম, শুকদেব জলঢাকা প্রজেক্টটা কোথায় বলতে পার?

শুকদেব বলল, এই মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না, তুমি কি ট্যুরে যাচ্ছ নাকি? আমি ভাই ঢাকা কোথায় তাই-ই বলতে পারব না। আমায় তো আর কানুদা কোথাও পাঠায় না—তা জলঢাকাতো দূরের কথা!

আমি বললাম, জলঢাকা প্রজেক্ট আপাতত তোমার এই ঘরে। এই দেখ আমার বইটা দিয়ে তোমার কুঁজো ঢাকা। সঞ্চয়িতা দিয়ে দুধ ঢেকেছ। আর এটা কি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত। এটাকে তুমি দেখছি বাড়ি শুকোবার ইঁট হিসেবে ব্যবহার করছ।

শুকদেব বলল, বই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত প্রয়োজনীয় তা দেখ।

কিন্তু বই পড়বার জন্য। শুধু আলমারি থেকে পাড়বার জন্য নয়।

শুকদেব বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, কে বললে আমি বই পড়িনা। সঞ্চয়িতা থেকে মুখস্ত বলে যেতে পারি শুনবে—দুর্গম গিরি কান্তার মরু···

আমি বললাম, শুকদেব তুমি সঞ্চিতা ও সঞ্চয়িতা গুলিয়ে ফেলছ। আনারস আর বেনারস কি এক– যদিও দুটোর মধ্যেই রস আছে।

বেশ বলেছ তো আনারস আর বেনারস। তাহলে তুমি বলছ মৃগ আর শাখামৃগ এক নয়?

মোটেই নয়। বোম্বে থেকে ব্রিস্বের যত ব্যবধান, এ দুটোর মধ্যে তার চেয়েও বেশি ব্যবধান।

তারপর বললাম, শুকদেব, বলতো এই বইটা কেমন লাগল? যাদব চক্রবর্তীর মোটা বাঁধানো বইটা শুকদেবের নাকের সামনে তুলে ধরলাম।

শুকদেব বলল, আঃ নাকের সামনে থেকে বই সরাও। বই নিয়ে যে এত নাকাল করবে কে জানত? আমাকে পরীক্ষা করে লাভ নেই। তুমিই ফেল করবে। যাই বল, বইটি পড়ে আমার তেমন কান্না পায়নি। তবে গল্পটা ঠিক জমেনি। একটু কাঁচা কাঁচা মনে হয়েছে। প্লটটা খুব ভালই। তবে শেষের দিকে মেলো ড্রামাটিক....

আরও এলোমেলো অনেক কথা আন্দাজে বলে যাচ্ছিল শুকদেব।

আমি বললাম, গুল মেরোনা শুকদেব। চালাকির দ্বারা কোন মহৎকাজ সিদ্ধ হয় না।

এই বলে যাদব চক্রবর্তী পাটিগণিতটা নিয়ে আমি শুকদেবের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম।

কিন্তু হায়, তখনই কি জানি যে শুকদেবের কানে আমার শেষ কথা কলিংবেলের মত বাজতেই থাকবে, অন্য কেউ এসে দরজা খোলা না পর্যন্ত।

শুকদেবের ডিউটি ছিল কর্পোরেশনে।

আমাকে বলল, চল, একটু কর্পোরেশন ঘুরে আসবে। ওখান থেকে বেরিয়ে নিজামে গিয়ে চিকেন রোল খেয়ে আসব।

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। শুকদেবের সঙ্গে কর্পোরেশনে গেলাম। কর্পোরেশনে শুকদেবের যা খাতির তা দেখলে তাক লাগে। নিচের গেট থেকেই অভ্যর্থনা।

আরে আইয়ে শুকদেবজী। কেইসা হাল হ্যায়?—দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল শুকদেবকে।

শুকদেব বলল, আর কেয়া হাল হোগা? হালখাতাকা পাতা মাফিক হাল হ্যায়। ইসকা মতলব, বহুত তেজী বাজার হ্যায়। লেকিন মিশিরজী চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধি নাহি হোতা হ্যায়।

মিশিরজী দু পুরুষ ধরে চাকরি করছে কর্পোরেশনে। বাংলা ভাল বোঝে। শুকদেবের কথা শুনে ঘাবড়িয়ে গেল। কিয়া শুকদেবজী, চালাকির দ্বারা—ম্যয় কেয়া চালাকি কিয়া?

ইয়াদ করকে দেখ। হামারা ভদ্দরলোককা এক বাত।

মিশিরজী বলল, আরে আপনে কেমনে জানলেন? হাঁ হাঁ সাচ, আমি শোচিয়েছিলাম, বরষরে টাইমে মুলুক চলিয়ে যাব। ক্ষেতি কা কাম করব। ওই টাইম আমার ভাতিজাকে আমার নামে বসিয়ে যাব। সে পাহারা দেবে। চাকরিও থাকবে জমিনও থাকবে। আপনে কেয়সা মালুম পড়লেন?

শুকদেব শিস দিতে দিতে দোতলায় উঠে গেল। বলল, নেহি বোলেগা ট্রেড সিকরেট হ্যায়।

দোতলার করিডরে একজন কাউনসিলরের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখা মাত্র শুকদেব যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, খাঁদুবাবু, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না।

কাউনসিলর খাঁদুবাবু এতক্ষণ হাসছিলেন। মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটো রসগোল্লার মত হয়ে গেল।

আপনি জেনে ফেলেছেন?

নির্ঘাৎ।—শুকদেব উত্তর দিল।

কি জেনেছেন?

চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

আমি বললাম, আঃ শুকদেব, রবীন্দ্রনাথ একথা বলেননি। বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

রবীন্দ্রনাথ একথা বলেননি কেন? তবে কি তিনি চালাকি করেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা তা মন্তব্য করবে না। সবাইকে কি সব কথা বলতেই হবে অথবা সবাইকে কি একই কথা বলতে হবে?

তা হয়ত নয়। তবে কিনা—তারপর কাউনসিলারের দিকে তাকিয়ে বলল, চালাকির দ্বারা—

কাউনসিলর এবার শুকদেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, জেনেই যখন ফেলেছেন, তখন যেন লিখবেন না।

শুকদেব বলল, তার কোন গ্যারান্টি দেব না। কি হয়েছিল বলে ফেলুন না?

কাউনসিলর বলল, আপনি তো সব জেনে ফেলেছেন?

কী জেনে ফেলেছি···

আমার চালাকির ব্যাপারটা। সত্যি, ভোটারদের কথা মনে না রেখে আমি শুধু লোটার কথা ভেবেছি। মানে ফয়দা লোটার।

আর করবেন না।

না। আর কখনও করি। এখন থেকে শুধু লোকের মঙ্গল করে যাব, হ্যাঁ।

শুকদেব আমাকে বলল, আজ দিনটা ভালই যাবে। চল চিফ এনজিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

আর একটা ঘরে চিফ এনজিনিয়র বসে অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পানীয় জল নিয়ে বৈঠক হচ্ছে। চিফ এনজিনিয়র বোঝাচ্ছিলেন, জলের পরিমাণ কমাতে হবে। মাটির নিচের জলের মজুতই কমে যাচ্ছে।

এমন সময় শুকদেব ঘরে ঢুকে বলল, মিঃ বক্সী চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না।

মিঃ বক্সী চমকে উঠে দেখলেন, শুকদেব। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে শুকদেববাবু আসুন আসুন। বসুন। চা খাবেন, না কেওড়া দেওয়া সরবৎ?

না না, বসব না।—শুকদেব বলে উঠল।

বসুন, বসুন, মিটিং শেষ হয়ে গেছে। এই আপনারা যান এখন। ফোনে মিট করব।

সবাই চ. গেলে মিঃ বক্সী শুকদেবকে বললেন, ধরে ফেলেছেন? আপনার চোখ এড়ান খুবই শক্ত। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে।

শুকদেব বলল, চালাকি করতে গেলেন কেন?

জলের পরিমাণ না কমালে কোল্ড ড্রিঙ্কস বিক্রি হবে না। তাই পানীয় জলের স্কিম ইচ্ছে করে কম রেখে দিচ্ছিলাম। আপনি ধরে ফেলেছেন। না, না আমি কথা দিচ্ছি— পানীয় জল কমবে না। দয়া করে লিখবেন না কিন্তু। এই কে আছিস, শুকদেববাবু এসেছেন সন্দেশ নিয়ে আয়।

শুকদেব ততক্ষণে চিফ এনজিনিয়রের সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে আমায় দিয়েছে। নিজেও একটা ধরিয়েছে।

ততক্ষণে বেয়ারা এসে গেছে। শুকদেব বলল, যাও কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এস।

সন্দেশ খাওয়ার পর মুখ মুছে শুকদেবের সঙ্গে কর্পোরেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি শুকদেব নিজামের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে হাঁটছে। আমি বললাম, কি শুকদেব, বলেছিলে নিজামে নিয়ে গিয়ে রোল খাওয়াবে।

শুকদেব বলল, দুটো তালশাঁস সন্দেশ খাওয়ার পর তোমার এখন রোল খেতে ইচ্ছে করছে, তুমি কি রাক্ষস নাকি হাঁদু? চল, চল, দেরী হয়ে গেলে কানুদা আবার রাগ করবেন।

এইবার আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, শুকদেব, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না।

ছবি এঁকেছেন ঃ লাহিড়ী

# 'প্রতিযোগীতা' দিয়ে শুরু

পলাশ মিত্র

হলুদ রঙের ছোট কাগজটা দেখে চমকে উঠলেন জ্যাঠামশাই। ওটা 'আবৃত্তি প্রতিযোগীতা'র একটা হ্যাণ্ডবিল। এ বিষয়ে হরিতকি বাগান লেনের অমুক ঠিকানায় হিরন্ময় সরকারের সঙ্গে অপরাহ্ন পাঁচটার মধ্যে 'প্রতিযোগিদে'র যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

হ্যাণ্ডবিলটা পড়তে পড়তে জ্যাঠামশাই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। কাগজটা ছিল তাঁর ভাইপো পানুর পড়ার টেবিলে। জ্যাঠামশাই নিজে বিয়ে-থা করেননি। ছোট ভাই ভাস্করের একমাত্র ছেলে পানুকে নিয়ে তাঁর অনেক আশা। পানু তাঁর শুধু ভাইপো-ই নয়, বন্ধুও বটে। যা কিছু কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা সবই পানুর সঙ্গে।

এ হেন পানুর টেবিলে এই ভুলে-ভরা হ্যাণ্ডবিলটা দেখে তিনি ভাবলেন, পানু বোধ হয় বানান ভুল ক্লাবের মেম্বার হয়ে গিয়েছে। জ্যাঠামশাই ভালভাবেই জানেন, চারিদিকে বানান ভুলের যে খেলা চলছে তাতে শিক্ষিত ছেলেরাও ভুল বানানে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। হচ্ছেও তাই।

পানু, ওরে ও পানু। হতভাগা গেলি কোথায়? —জ্যাঠামশাই প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন।

পাশের ঘরে পাঁউরুটিতে জ্যাম না জেলি কি একটা মাখিয়ে পানু সবে একটা কামড় দিয়েছে, এমন সময় জ্যাঠামশায়ের বজ্রসম কণ্ঠ। পাঁউরুটিটা না পারছে খেতে, না পারছে ফেলতে, এই অবস্থায় ভীরু শশকের মত ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র শ্রীমান পানু জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্যাঠামশাই তখন রাগে গজগজ করতে করতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। হ্যাণ্ডবিলটা নাড়তে নাড়তে পানুকে বললেন, এটা কে দিয়েছেন তোমাকে? কোথা থেকে পেয়েছ এটা?

—আজ্ঞে, ওটা, ওটা তো। পানু রীতিমত ঘাবড়ে যায়। এই হ্যাণ্ডবিলটা যে কি দোষ করল, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

—ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে পার। জ্যাঠামশাই এতক্ষণে একটু যেন শান্ত। এরই ফাঁকে কখন যে ভগীরথ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা জ্যাঠামশাই খেয়াল করেননি। চায়ে চুমুক দিয়ে পানুর দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার ভাল নামটা যেন কি পানু?

এতক্ষণ পানুর মাথাটা ঘোরেনি। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হল, সে এইবারে বোধ হয় চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। পানুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে, তোমার নামের বানানটা এই খাতায় লেখ। গোটা গোটা অক্ষরে পানু লিখল—প্রদ্যোত।

ঠিক আছে। ভেরি গুড। কিন্তু তোমাদের ক্লাসের অনেকেই এই বানান কীভাবে লেখে জান কি? শুধু তোমাদের ক্লাসের কেন, সারা দেশের কত ছেলেমেয়েরা যে 'প্রদ্যোত'কে 'প্রদ্যুৎ' লিখছে, তা আর কি বলব! জ্যাঠামশায়ের কণ্ঠে বিষাদের সুর শোনা যায়।

পানু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলটায় কি এমন লেখা আছে, যার জন্য জ্যাঠামশায়ের এই ক্রোধ? উত্তরটা জ্যাঠামশাই নিজেই দিলেন। হ্যাণ্ডবিলটা পানুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা ভাল করে পড় আর বল কোথায় কি কি ভুল আছে?

বাংলা বানান খুব একটা ভাল না জানলেও জ্যাঠামশায়ের তাড়নায় কিছু কিছু শুদ্ধ বানান আর তার নিয়মকানুন সে রপ্ত করতে পেরেছে। হলুদ কাগজটা হাতে নিয়ে পানু ভাল করে চোখ বুলিয়ে বলল, জ্যাঠামণি, প্রথমেই আবৃত্তি 'প্রতিযোগীতা'র 'প্রতিযোগীতা' বানানটা ভুল। গ-এ দীর্ঘ-ঈ-কার ওতে চলবে না। ওখানে হ্রস্ব ই-কার বসাতে হবে।

'সহযোগিতা' বানানেও হ্রস্ব-ই-কার।

জ্যাঠামশাই খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু 'হরিতকি' বানানটা কি তুমি খেয়াল করেছ? কথায় কথায় হ্যাণ্ডবিলের আবির্ভাবের কাহিনী জ্যাঠামশাই শুনতে ভুলে গিয়েছিলেন। পানুর কথায় জানা গেল, ওটা বাজার যাবার সময় সকালে কার কাছ থেকে যেন পেয়েছে। আর এদের সঙ্গে পানুর কোনও যোগাযোগ নেই। জ্যাঠামশাই শুনে সুখী হলেন।

—হ্যাঁ, এবারে বল 'হরিতকি'র অবস্থাটা কি?

—'হরিতকি' বানানটা ভুল জ্যাঠামশাই। ওখানে দুটোতেই দীর্ঘ-ঈ-কার হয়ে হবে হরীতকী।

—চমৎকার। জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে বলেন। তবে মনে রেখ, ঐ যে প্রতিযোগিতার কথা আছে, ওখানে কিন্তু ভুল বানানে 'প্রতিযোগি'দের কি যেন করতে বলা হয়েছে। প্রতিযোগী, সহযোগী সব কিন্তু দীর্ঘ-ঈ-কার।

এতক্ষণে পানুর ভয় বোধ হয় কেটে গেছে। বলে, আমি এসব বানান জানি জ্যাঠামশাই।

আরও শোন, জ্যাঠামশাই বলেন। তুমি বরং খাতা-কলম নিয়ে লিখে নাও। আমি বলে যাই। জ্যাঠামশাই বলতে থাকেন—

সহযোগিতা, কিন্তু সহযোগী। প্রতিযোগিতা, কিন্তু প্রতিযোগী। অপকারিতা, কিন্তু অপকারী। উপযোগিতা, কিন্তু উপযোগী। উপকারিতা, কিন্তু উপকারী। স্বেচ্ছাচারিতা, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী। বিলাসিতা, কিন্তু বিলাসী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী।

এবারে ভগীরথের ডাক পড়ল। ভগীরথকে দেখে জ্যাঠামশায়ের ভাগীরথীর কথা মনে পড়ল। বললেন, ভাগীরথীর মতই মনীষী, সমীচীন, হরীতকী এইসব শব্দ দীর্ঘ-ঈ দিয়ে হবে। ওই হ্যাণ্ডবিলটায় হরীতকী বানানটা যে ভুল সেটা পানুর নজরে পড়ায় জ্যাঠামশায়ের তাই খুশি হবারই কথা।

এবারে পানু-ই শুরু করল।—হ্যাণ্ডবিলে জ্যাঠামশাই, হিরণ্ময় সরকারের নাম 'হিরন্ময়' হয়ে গিয়েছে। দন্ত্য-ন হবে না; হবে মূর্ধন্য-ণ।

সাবাশ! পানুর পিঠ চাপড়ে জ্যাঠামশাই বললেন, হ্যাঁ। তবে মনে রেখ: হিরণ্ময়, কিন্তু মৃন্ময়। ষাণ্মাসিক, কিন্তু ঈষন্মাত্র।

জ্যাঠামশায়ের রাগ আর বিন্দুমাত্র নেই। কে বলবে, কিছুক্ষণ আগে এই মানুষই প্রচণ্ড রাগে অগ্নিমূর্তি হয়েছিলেন। পানুর মা সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, ভুল বানান দেখলে ওঁর নাকি মাথায় খুন চেপে যায়।

হ্যাণ্ডবিলের 'অপরাহ্ন' বানানের চেহারা দেখে পানু আর তার জ্যাঠামশাই এবারে হাসতে লাগলেন। জ্যাঠামশাই বললেন, কার ওপর আর রাগ করব। নামকরা সব কাগজেও দেখি, 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' বানানে য-ফলা দেওয়া হয় না। হ্যাণ্ডবিলের আর দোষ কি।

'অপরাহ্ণ' বানানে হবে মূর্ধন্য-ণ। এইরকম পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ শব্দগুলোতে হ-এ মূর্ধন্য-ণ। কিন্তু মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নতে

হ-এর সঙ্গে দন্ত্য-ন যুক্ত হবে। কেননা, র-এর পরে হ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে মূর্ধন্য-ণ আর এই ণ থাকে হ-এর নিচে। কিন্তু মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন-তে হ-এর সঙ্গে যুক্ত হয় দন্ত্য-ন। ভাল করে মনে রেখ, এই ন থাকে হ-এর পাশে।

জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, এই তোমার নামের কথাই ধর না কেন। প্রদ্যোতের মত রঞ্জিত, অচ্যুত বানানে 'ৎ' দিলে ভুল হবে। কিন্তু রণজিৎ, বিশ্বজিৎ বানানে 'ত' চলবে না। ওখানে চাই 'ৎ'। একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ল—জ্যাঠামশায়ের উৎসাহ যেন ক্রমে ক্রমেই বাড়ছে। বলুন জ্যাঠামণি —পানুও কম যায় না। ও জানে, বানান ভুল লিখলে লোকে মূর্খ ভাববে। ব্যাপারটা খুবই লজ্জার।

জ্যাঠামশাই শুরু করেন।

'উচিত' শব্দে 'ৎ' দিলে কিন্তু মারাত্মক অপরাধ হবে। কত মানুষ যে 'ৎ' দিয়ে 'উচিত' লেখেন, দেখলে লজ্জায় মরে যাই। এই রকমই 'কুৎসিত' শব্দে প্রথমে 'ৎ', পরে 'ত'। উচিত আর কুৎসিত শব্দের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

আর একটা ভুল বানানে দেশ ছেয়ে আছে। 'ক্ষ'-এর জায়গায় 'খ' লেখবার ঝোঁক তোমাদের মধ্যে খুব দেখতে পাচ্ছি। যেমন, 'আকাঙ্ক্ষা' লিখতে সব সময় 'ক্ষ' ব্যবহার করতে হবে। কখনই 'খ' নয়। একজন পণ্ডিত ঠিকই বলেছেন, আকাঙ্ক্ষা যদি বিশুদ্ধ না হয়, ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না।

দরজার কাছে আবার ভগীরথের আগমন। হাতে চায়ের কাপ নেই। সুতরাং অর্থ সহজ। মা তাড়া দিচ্ছেন, আপনারা কি নাইতে যাবেন না?

যাব বাবা যাব। এই উঠলুম বলে।

কিন্তু সেই হলুদ হ্যাণ্ডবিলটা? যাকে নিয়ে এত কাণ্ড। সেটা কোথায় গেল?

খুঁজতে খুঁজতে সেটা পাওয়া গেল জ্যাঠামশায়ের ফতুয়ার ডান পকেটে। দলা পাকিয়ে ওটা কখন যে তাঁর পকেটে স্থান নিয়েছে, সেটা এতক্ষণ বোঝা যায়নি।

পানু উঠে পড়েছে। জ্যাঠামশাই বললেন, সামনের রবিবার তোমার সঙ্গে আবার বসব। বানান নিয়ে কথা হবে। আর হ্যাঁ, আজ বাজার থেকে কি মাছ এনেছিস রে?

—ট্যাংরা। পানুর জবাব।

—খাসা। এই না হলে আমার ভাইপো।

# মাষ্টা' মশাই

## শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

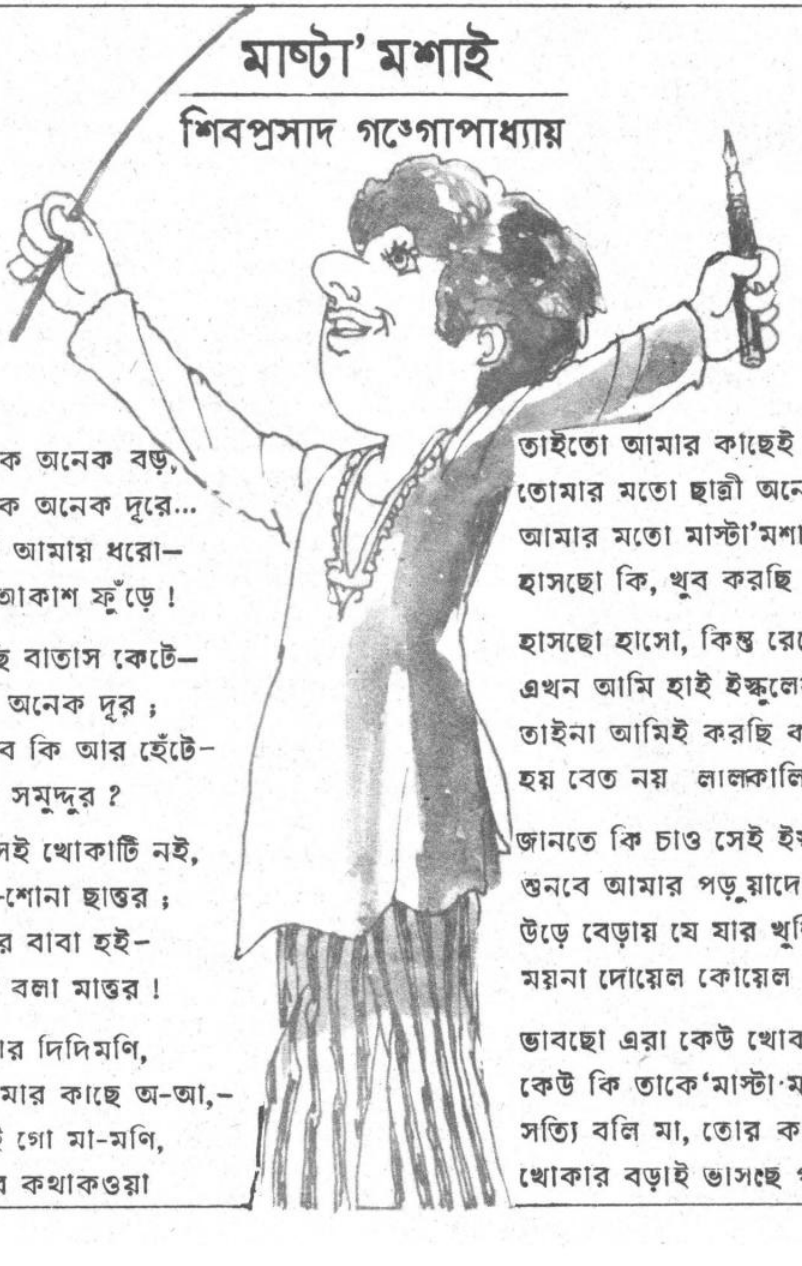

আজকে আমি অনেক অনেক বড়,
আজকে আমি অনেক অনেক দূরে...
ধরার সাধ্যি থাকলে আমায় ধরো—
এখন আমি উঠছি আকাশ ফুঁড়ে!

হাঁটছি না তো, ছুটছি বাতাস কেটে—
ছুটছি, যাবো আরো অনেক দূর;
ধরতে আমায় পারবে কি আর হেঁটে—
পেরিয়ে যখন যাচ্ছি সমুদ্দুর?

আর তো তোমার সেই খোকাটি নই,
নই সে বোকা কথা-শোনা ছাত্তর;
বরং আমিই তোমার বাবা হই—
শুনবে যা কই কথা বলা মাত্তর!

নও তুমি আর আমার দিদিমণি,
পড়বো না আর তোমার কাছে অ-আ,—
তোমার মাস্টা'মশাই গো মা-মণি,
এখন আমি; শিখবে কথাকওয়া

তাইতো আমার কাছেই সুযোগ পেলে!
তোমার মতো ছাত্রী অনেক পড়াই,
আমার মতো মাস্টা'মশাই মেলে!
হাসছো কি, খুব করছি বলে বড়াই?

হাসছো হাসো, কিন্তু রেখো মনে—
এখন আমি হাই ইস্কুলের টিচার:
তাইনা আমিই করছি কতজনের
হয় বেত নয় লালকালিতে বিচার!

জানতে কি চাও সেই ইস্কুল কেমন,
শুনবে আমার পড়ুয়াদের কথা?—
উড়ে বেড়ায় যে যার খুশি যেমন—
ময়না দোয়েল কোয়েল কি বউ-কথা....

ভাবছো এরা কেউ খোকাকে মানে,
কেউ কি তাকে'মাস্টা·মশাই' বলে,
সত্যি বলি মা, তোর কানে কানে:
খোকার বড়াই ভাসছে পুকুরজলে!

ছবি : জি. সাহা

# সেই তো আমার

**রেবন্ত গোস্বামী**

উঠোন কোণে লেবুর তলায় রৌদ্রছায়ার খেলা—
সেইখানে মোর শান্ত ছেলেবেলা।
নীলমাখানো আকাশতলে তুলো মেঘের ভেলা—
ভাসত আমার সোনার ছেলেবেলা।

রোদ ঝিলমিল ঝিলের জলে শালুক দোদুল দোলে
কচুর পাতায় টুপটুপানি মুক্তো পড়ে গলে,
এমন করে সোহাগভরে ডাকত কে ভোরবেলা ?
ডাকত আমার সোনার ছেলেবেলা।

ডুব দিয়ে যায় পানকৌড়ি পাখায় বাঁধা সুতো,
উঠোনভরা ধানমৌরি গরুবাছুর দুটো,
ঘুম-ঘুম সুর ক্লান্ত ঘুঘুর নিঝুম দুপুরবেলা—
ঢুলত আমার অলস ছেলেবেলা।

কালবোশেখী উঠল আবার কাজল-কালো মেঘে,
উথালপাথাল আমকাঁঠালও মাতাল যে আবেগে,
সে আমতলায় কে ছুট লাগায় মনটা পেখমমেলা ?
ছুটছে আমার দামাল ছেলেবেলা।

দিনের আলো নিভলো যখন—খেলার পালা সারা,
আকাশকোণে একটি দুটি ফুটে উঠল তারা,
কিসের শোকে কাঁদছে ও কে এমন সাঁঝের বেলা ?
কাঁদছে আমার দুঃখী ছেলেবেলা।

কদম-ভেজা শ্রাবণ যেথা, শরৎ শিউলিঝরা,
ফাগুন যেথা শিমুলরাঙা, ঘেঁটুর গন্ধভরা,
পথের ধারে নদীর পাড়ে হাজার রঙের মেলা—
যেথায় আমার রঙিন ছেলেবেলা।

হারিয়ে যাওয়া কান্নাহাসি, বইখাতা আর খেলা—
সেই তো আমার মধুর ছেলেবেলা।

# সন্দেহ

**শমীন্দ্র ভৌমিক**

বয়স হলো আশি
এই বয়সেও ঠাকুর্দাদার ঠোঁট ভরিয়ে হাসি
'দিন ফুরোলেই আঁধার নেমে থমথমাচ্ছে গাঁ-টা
ঐদিকের সেই শিমুলবনে মামদো ভূতের হাঁটা'
এইভাবে ঠিক ঠাকুর্দাদা গল্পের আজগুবি
বলেন যখন সত্যি তখন মজাও লাগে খুবই

একটু দেব পড়ায় ফাঁকি মাঠে যাবার জো-কী !
চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলেন
কোথায় খোকা খোঁকি ?

চুল পাকেনি গোঁফ পাকেনি সুস্থ সুঠাম দেহ
কিন্তু ঠাকুর্দাদার মনে একখানি সন্দেহ
এ্যাত্তো কিচ্ছু খাচ্ছে তার এই নাতনি এবং নাতিম
গড়ন কেন পাঠকাঠি আর ইঞ্চি বারো ছাতিম ?

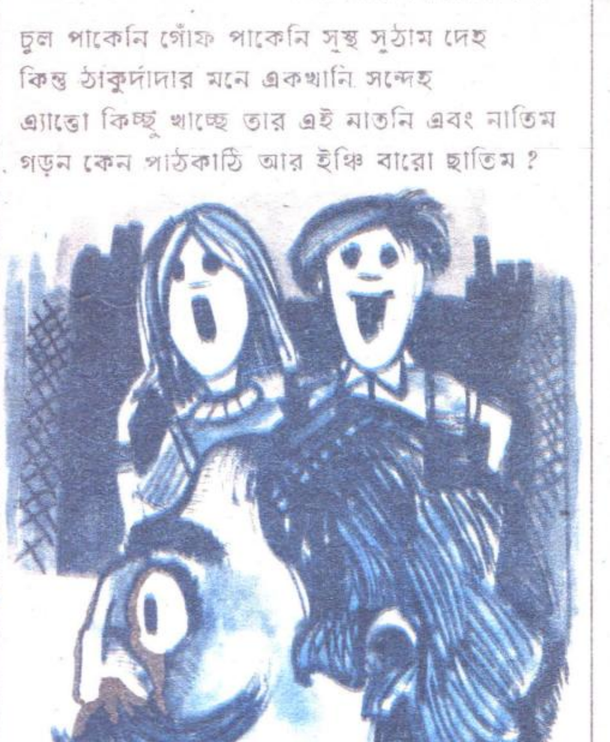

গ্রাম ছেড়ে অনেক অনেক পথ ছুটে এসে আহত, ক্লান্ত সুভাগা এসে থামল সূর্যমন্দিরের সামনে। আকাশে তখন সূর্যাস্তের আয়োজন। বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁর বাসনা জানাচ্ছেন সূর্যদেবকে।
আর কতকাল একাকী এ মন্দিরের দায় বইতে হবে সূর্যদেব।
একি! তোর এ দশা কে করেছে মা!
অভাগীকে আশ্রয় দাও বাবা!
ছিঃ মা! ভাগ্যকে দোষারোপ করতে নেই। কার ভেতর কি মঙ্গল লুকিয়ে আছে, তা কে বলতে পারে মা।
আমার ভাগ্য বাবা!
সূর্যদেবের কাছে আশ্রয় চাও মা।
সূর্যমন্দিরেই আশ্রয় পেয়ে গেল সুভাগা। সূর্যদেব বোধ হয় বৃদ্ধ পুরোহিতের একাকীত্বের জ্বালা দূর করতেই মেয়ের মত এই কন্যাকে এনে দিলেন।

সভাগাও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করল তার আশ্রয়কে। সূর্যমন্দির হল তার ধ্যান-জ্ঞান। সে মন্দির ঝেড়ে মুছে ঝক্‌ঝকে করে তুল্‌ল। কুণ্ড থেকে জল আনল, মালা গাঁথল দেবতার জন্য। এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন বৃদ্ধ পুরোহিত সুভাগাকে ডেকে বললেন—
মা! আজ থেকে তোমাকে পূজার দায় নিতে হবে।
কেন বাবা?
আমি দেবতার ডাক শুনেছি মা। আজ আমার শেষ পূজা।
একি কথা বলছেন বাবা!
আজ তোমাকে যে সূর্য-মন্ত্র শেখালাম তা জীবনে দুবার উচ্চরণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। আমার জীবনে সে মন্ত্র এই দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হল।


এরপর ৬২ পৃষ্ঠায়

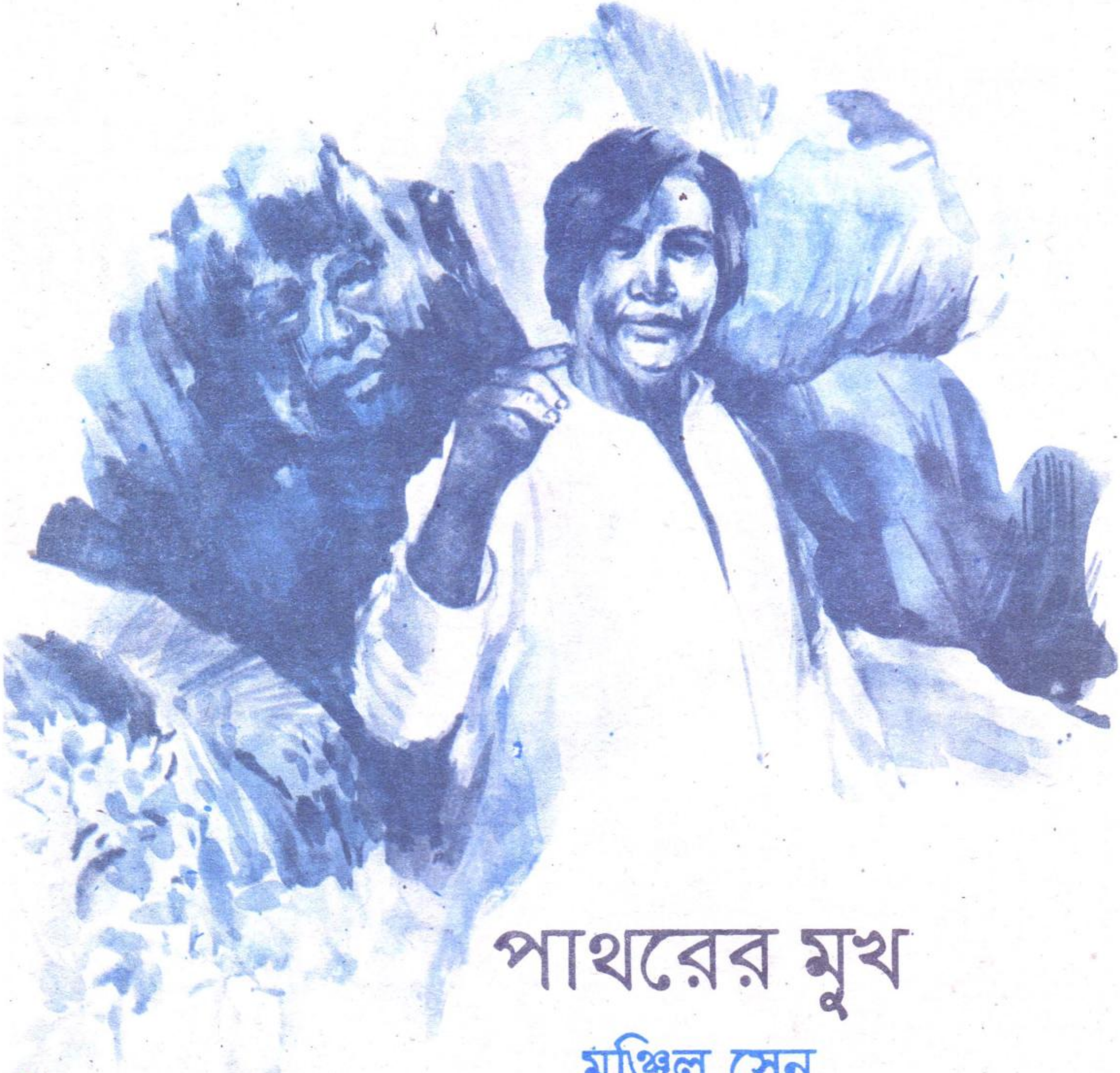

# পাথরের মুখ

মঞ্জিল সেন

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যের জন্যেই নয়, এখানকার মাটিতে ফলে সোনালি ফসল, তাই যেমন গড়ে উঠেছে ঘন বসতি, তেমন বাইরের মানুষও এখানকার সৌন্দর্যসুধা পান করতে ছুটে আসে দুর্নিবার একটা আকর্ষণে। চোখ তুললেই দেখা যায় শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়, গিরিশৃঙ্গ আর শিলাস্তূপ। এমন একটা শিলাস্তূপ নিয়েই আমাদের এই কাহিনী।

দূর থেকে শিলাস্তূপটিকে প্রকাণ্ড এক মানুষের মুখ বলে মনে হয়। চওড়া কপাল, খাড়া নাক, শক্ত চোয়াল, দৃঢ় চিবুক—যেন এক ভাস্করের অবিস্মরণীয় কীর্তি। কাছ থেকে ওটাকে কিন্তু শিলাস্তূপ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না; শুধু যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই ওটা স্পষ্ট মুখের আকার নিতে থাকে। আরও একটা জিনিস যা চোখে পড়ে তা হল, ওই প্রকাণ্ড পাথরের মুখে যেন শান্ত মহৎ এক ক্ষমাসুন্দর ভাব। বংশ-পরম্পরায় এখানকার মানুষ ওই পাথরের মুখকে দেখে আসছে, ওদের সুখ-দুঃখ সব কিছুর সঙ্গে পাথরের মুখের যেন গড়ে উঠেছে এক নিবিড় সম্পর্ক।

এক চাষী বউ আর তার ছেলে জীবন তাদের কুটিরের সামনে বসে কথা বলছিল। জীবন যখন খুব ছোট তখনই সে বাবাকে হারিয়েছে।

পড়ন্ত বেলা, অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণরশ্মি পাথরের মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু কণ্ঠে জীবন বলে ওঠে, ওই দয়ালু মুখের মত মানুষ কি কোনদিন দেখব না মা ?

মা বললেন, প্রবাদ যদি সত্যি হয়, তবে একদিন না একদিন ওই মুখের আদলের একজন মানুষের দেখা পাওয়া যাবেই।

ছোট্ট ছেলে জীবন আগ্রহভরে প্রবাদটা কি জানতে চায়। মা বলেন, লোকে বলে, এখানে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, যাঁর মুখ হবে অবিকল ওই পাথরের মুখের মত।

সত্যি !—ছেলে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর দেখা পাব।

মা সস্নেহে বলেন, যদি তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে নিশ্চয়ই দেখা পাবে।

দিন কাটে, মাস কাটে, বছর গড়িয়ে যায়। জীবন বড় হয়েছে, তার মা আর বেঁচে নেই। জীবন জমিতে চাষ করে, কঠিন পরিশ্রমে মাটিতে সোনা ফলায়। সরল, অনাড়ম্বর তার জীবন। শুধু একটি মাত্র তার বিলাসিতা, পড়ন্ত বেলায় কুটিরের সামনে খোলা জায়গায় বসে পাথরের মুখের দিকে শুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। ওই মুখের ধ্যানগম্ভীর করুণাধারার মধ্যে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এই সময় ঐ অঞ্চলে রটে গেল এতদিন পর সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে, পাথরের মুখের আদলের মানুষ আসছেন। যিনি আসছেন, তাঁর নাম বিনয়েন্দ্র। ওই অঞ্চলেরই মানুষ তিনি। অল্প বয়সে ভাগ্যান্বেষণে তিনি চলে গিয়েছিলেন দূর শহরে। অধ্যাবসায় ও কঠোর পরিশ্রমে আজ তিনি কোটিপতি। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় যা কিছুতে তিনি হাত দিয়েছেন তাই সোনা হয়েছে। মস্ত বড় ব্যবসায়ী বলে দেশে দেশে তাঁর নাম ছড়িয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর পৈতৃক ভিটেয় ফিরে আসছেন, শেষ জীবনটা এখানেই কাটাবেন। তিনিই যে পাথরের মুখের মূর্ত প্রতীক সে বিষয়ে এখানকার মানুষের মনে কোন দ্বিধা নেই।

বিনয়েন্দ্রর বাপ-পিতামহের ভিটের ওপর দেখতে দেখতে সুরম্য এক প্রাসাদ গড়ে উঠল ; সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি অতুলনীয় সেই পুরী মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তারপর একদিন বিনয়েন্দ্র এলেন, খোলা গাড়িতে চেপে পথের দুধারে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি তাঁর প্রাসাদপুরীর দিকে এগিয়ে চললেন। জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল ; অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগল, ইনিই সেই মহাপুরুষ।

জীবনও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর স্বপ্নের মানুষের দর্শন পাবার আশায় তার মন নেচে উঠেছিল অপার আনন্দে। অনেক আশা নিয়েই সে এসেছিল, কিন্তু বিনয়েন্দ্রকে দেখে তার মন ভরল না, সে যেন হতাশ হল। লোলচর্ম ঐ বৃদ্ধের মুখে পাথরের মুখের শান্ত, সৌম্য, গভীর অনুকম্পার কোন সাদৃশ্যই সে খুঁজে পেল না। বাড়ির পথ ধরল জীবন। পথে যেতে যেতে বার বার সে তাকাতে লাগল চির পরিচিত সেই মুখটির দিকে। তার মনে হল সেই মুখ যেন তার কানে কানে বলছে, আসবেন, তিনি আসবেন।

আরও কয়েক বছর কেটে গেছে। জীবন এখন পূর্ণ যুবক। তার সহজ, সরল জীবনযাত্রার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। নিজের কাজ ছাড়াও অপরকে সে অযাচিতভাবে সাহায্য করে, উপদেশ দেয়। লেখাপড়া তেমন না শিখলেও এক অদ্ভুত ক্ষমতার সে অধিকারী হয়েছে সুন্দর সুন্দর কথা বলে। ঈশ্বরের কথা, সদ্‌জীবন-যাপনের কথা, ভাল ভাল সব কথা। লোকে তাকে ভালবাসে, আপনজন মনে করে। এতেই তার আনন্দ, এতেই প্রশান্তি।

বিনয়েন্দ্র আজ অতীত স্মৃতি। শেষ জীবনে ব্যবসায় ভরাডুবি হয়ে তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। ভগ্নহৃদয়ে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এমন সময় উপত্যকায় রটে গেল, আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষ আসছেন। তিনিও এখানকার মানুষ। দেশের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছেন। সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, সেনাপতির পদ আজ তাঁর করায়ত্ত। দেশকে তিনি জয়ের, গৌরবের পথে নিয়ে গেছেন। ধন্য ধন্য রব উঠেছে তাঁকে ঘিরে। বহুদিন পর তিনি তাঁর জন্মস্থানে আসছেন, তাই সমস্ত উপত্যকা জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল, তাঁকে বীরোচিত মর্যাদায় স্বাগত জানাবার চলতে লাগল প্রস্তুতি।

অবশেষে তিনি এলেন। অভ্যর্থনা সভায় জনতা একবাক্যে স্বীকার করল, সেনাপতির মুখের সঙ্গে পাথরের মুখের অপূর্ব সাদৃশ্য। জীবনও তাঁকে দেখল। দেখল একজন দৃঢ়চেতা মানুষের মুখ, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা, কিন্তু পাথরের মুখের সেই স্নিগ্ধ, দরদী প্রতিচ্ছবি কোথাও সে খুঁজে পেল না। আশাভঙ্গের নিদারুণ ব্যর্থতা নিয়ে সে ফিরে চলল সভা থেকে। চলে গেল সেই উপত্যকায়। পাথরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল ওটা যেন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় সুষমা। ওই মুখ যেন তার কানে কানে বলল, ধৈর্য ধর জীবন, তিনি আসবেন। তিনি আসবেনই। জীবন ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলল।

আরও কয়েক বছর কেটে গেছে, জীবন এখন মধ্যবয়সী। সদাশয়তার জন্য আজ তার নাম উপত্যকার মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। মানুষের মঙ্গলচিন্তাই যেন তার ধ্যান। তার শান্ত, সংযত জীবনের সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে কুলুকুলু বয়ে যাওয়া এক স্রোতস্বিনী নদীর। যে নদী আপন মহিমায় মহিমান্বিত, গতিপথে দু'পাশের জমিকে উর্বরা আর শস্যশ্যামলা করে ধেয়ে চলেছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। নিজের অজান্তেই জীবন এক ধার্মিক মানুষে পরিণত হয়েছে। তাকে কিন্তু কেউ অসাধারণ বলে ভাবে না, জীবন নিজেও কখন ভুলে অমন চিন্তা মনে ঠাঁই দেয় না, কিন্তু তার মুখ দিয়ে যেসব সুন্দর সুন্দর কথা বেরিয়ে আসে তা ঠিক সাধারণ মানুষের কথাও নয়।

ইতিমধ্যে মানুষের ভুল ভেঙেছে, সেনাপতির সঙ্গে পাথরের মুখের বৈষম্য তারা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু মানুষ আশার দাস। আবার রটে গেল পাথরের মুখের মত মানুষের সন্ধান এতদিনে পাওয়া গেছে। ইনি আর কেউ নন, একজন দেশবরেণ্য নেতা, যাঁর জন্ম এই উপত্যকায়। তিনিও অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে আজ তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গি শ্রোতাদের যেন সম্মোহিত করে, তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা মানুষের রক্তে চাঞ্চল্য জাগায়। সম্মান ও প্রতিপত্তির শীর্ষ শিখরে দাঁড়িয়ে আজ তিনি দেশের শ্রেষ্ঠতম আসন, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী। তাঁর মুখের সঙ্গে পাথরের মুখের যেন অবিকল সাদৃশ্য। নির্বাচনের আগে সেই জননেতা তাঁর জন্মস্থানে আসছেন। উপত্যকার মানুষদের মনে আবার আশা জেগে উঠল। মহাপুরুষ এবার সত্যিই আসছেন। তারাও তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

গাড়িতে গাড়িতে উপত্যকা ভরে গেল। গণ্যমান্য পুরুষরা এই উপলক্ষে ওখানে সমবেত হতে লাগলেন, সরগরম হয়ে উঠল উপত্যকা।

তিনি এলেন। জনতা সমস্বরে তাঁর জয়ধ্বনি করল, তারপর বলে উঠল, পাথরের মুখের দিকে চেয়ে দেখ, যেন দুই যমজ ভাই।

জীবনও অধীর আগ্রহে তার বাঞ্ছিত মানুষটির দর্শনের আশায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। তারও মনে হল, পাথরের মুখের সঙ্গে মহান নেতার মুখের কি ভীষণ মিল ! কিন্তু ওকি ! এ মুখ যেমন বলিষ্ঠ তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কিন্তু পাথরের মুখের স্নিগ্ধ কমনীয়তা, নমনীয় অভিব্যক্তি, চোখের সেই করুণা কোথায় নেতার মুখে ! জীবন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে চলল। এটা তার জীবনের চরম হতাশা। প্রবাদ বাক্য তার জীবনে আর সফল হল না, তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল। জীবন করুণ দৃষ্টি তুলে তাকাল পাথরের মূর্তির দিকে।

হঠাৎ জীবনের মনে হল, প্রশান্ত হাসিতে ভরে গেছে পাথরের মুখমণ্ডল। তার ঠোঁট দুটি যেন নড়ছে। পাথরের মুখ যেন বলছে, জীবন, আমি তোমার চাইতে বহু বেশিদিন অপেক্ষা করে আছি, কই আমি তো হতাশ হইনি। ধৈর্য ধর, তিনি আসবেন, তিনি আসছেন !

বছর কেটে যায়। এখন জীবনের মাথার চুলে পাক ধরেছে, কপালে কুঞ্চন, মুখে বলিরেখা। জীবন এখন বৃদ্ধ। কাল শুধু তার মুখের বলিরেখায় আঁচড় কাটেনি, সময়ের স্রোতের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে তার অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির পরিধি। জীবনের এক গভীর সত্য যেন খেলা করছে তার মনে। সেই সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার মুখে, চোখে।

জীবনের কাছে এখন নিত্য বহু লোকের আনাগোনা। উপত্যকা ছাড়িয়ে বহু দূর-দূরান্ত থেকে বহু বহুলোক আসে তার কাছে। জীবন তাদের সামনে বসে জীবনের নানা সমস্যার কথা বলে যায়। কত তত্ত্ব, তথ্য, কত অভিজ্ঞতা! লোকেরা ভাবে এই সরল সাদাসিধে লোকটা এত জ্ঞান পেল কোথায়! আসলে জীবন যখন বলতে থাকে তখন তার মন আপনা থেকে আলোতে ভরে যায়। কোথা থেকে বাণী এসে ভর করে তার মুখে। যারা শোনে তারা তন্ময় হয়ে যায় শান্তিতে ভরে যায় তাদের মন। আনন্দে তাদের চোখে নামে অশ্রুধারা। তারা যে পথ দিয়ে ফিরে যায়, সেই পথেই ছড়াতে ছড়াতে যায় জীবনের নাম।

অধ্যাপক, দার্শনিক, এঁরাও জীবনের খ্যাতির আকর্ষণে ছুটে আসেন, তার সঙ্গে কথা বলে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় তাঁরা অভিভূত হয়ে যান। জীবন সবাইকে তার সহজাত সারল্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়; তার অকুণ্ঠ, সহজ ব্যবহারে তাদের মন জয় করে নেয়। বাইরে থেকে যে সব মনীষীরা আসেন, তাঁরা জীবনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অনির্বচনীয় তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাবার সময় পাথরের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকান। তাঁদের মনে হয় এ যেন পরিচিত মুখ, কিন্তু কোথায় দেখেছেন তা মনে করতে পারেন না।

এই সময় দেশে এক নবীন কবির আবির্ভাব চমক জাগাল। কবি ঐ উপত্যকারই মানুষ, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাঁর কেটেছে বাইরে। তাঁর কবিতায় যেন নির্ঝরিণীর ছন্দ। কবির বাল্যের স্মৃতি, সবুজ উপত্যকার কাব্যময় রূপ, সমুন্নত গিরিশৃঙ্গের ধ্যান-গম্ভীর চিত্র, মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। পাথরের মুখকেও কবি অসামান্য কাব্যগাথায় অমর করে তুলেছেন। স্বর্গীয় সুষমার সঙ্গে মর্তের এক স্বর্ণালী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন কবি—অপূর্ব এক কীর্তি।

জীবনের পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও সে নিরক্ষর ছিল না। কবির কাব্যগ্রন্থ তার হাতেও এসেছিল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সে আকাশের তলায় বসে ঐ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করত, আর মাঝে মাঝে পাথরের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাত। কাব্যমালার প্রতিটি ছত্র নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করতে করতে তার হৃদয় অপার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত, দুচোখ বেয়ে নামত অশ্রুধারা। এত সহজ, সুন্দরভাবে এর আগে আর কেউ মানুষের ভাল দিকটা তুলে ধরেনি। পাথরের মুখের দিকে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলত, এই মহান কবি কি তোমার অনুরূপ হবার যোগ্য নয়?

পাথরের মুখে যেন হাসি খেলে যেত।

এদিকে জীবনের বিচিত্র কাহিনী লোকের মুখে মুখে কবির কানেও পৌঁছোয়। এই অসাধারণ মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়।

এক মধুর অপরাহ্ণ বেলায় কবি এসে দাঁড়ালেন জীবনের পরিচ্ছন্ন কুটিরের সামনে। জীবন যথারীতি তার প্রিয় স্থানটিতে বসেছিল, তার কোলে কাব্যগ্রন্থটি খোলা আর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে সেই পাথরের মুখের ওপর। কবির মনে হল যেন ধ্যানমগ্ন এক তপস্বী।

কবি এগিয়ে এলেন, বললেন, আজ রাতের মত আমাকে আশ্রয় দিতে পার?

সানন্দে,—জবাব দিল জীবন, তারপরই হাসি মুখে বলে উঠল, পাথরের মুখে আজ যে আনন্দের দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি, আগে কখনও তা দেখিনি।

কবি জীবনের পাশে বসলেন, দুজনের মধ্যে কথা শুরু হল। কবি জীবনে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারার গভীরতা স্পর্শ করল তাঁর হৃদয়, অপার আনন্দ অনুভব করলেন তিনি। যা কিছু মহৎ, যা সত্য, তা যেন এই মানুষটির সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠছে। যেমন সরল মানুষটি তেমন সহজ তার কথাবার্তা। কিন্তু কি অসাধারণ, কি গভীর আবেগ-মথিত প্রতিটি কথা!

কবির সঙ্গে কথা বলে জীবনও বিচলিত। এতদিন তার কাছে যাঁরা এসেছে তাঁদের তুলনায় নবাগত যেন ভিন্ন। কবির কথাবার্তার মধ্যে তাঁর কাব্যে চিত্রিত অতুল সৌন্দর্য-বৈভব প্রকাশ পেতে থাকে, আর উতলা করে তোলে জীবনকে। দুজনের চিন্তাধারাই যেন এক সূত্রে গাঁথা।

কবির কথা জীবন মাথা নিচু করে তন্ময় হয়ে শুনছিল। হঠাৎ মাথা তুলতেই তার মনে হল পাথরের মুখটাও যেন নিচু হয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে। কবির উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে জীবন বলে উঠল, হে গুণী, তুমি কে?

কবি আঙুল দিয়ে জীবনের কোলের ওপর রাখা কাব্যগ্রন্থটি দেখিয়ে বললেন, তুমিযেকাব্যটি পাঠ করছ তা আমারই রচনা।

জীবন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার কবির মুখ এবং পর মুহূর্তে পাথরের মুখ যেন মিলিয়ে দেখল তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দুঃখভরে মাথা নাড়ল।

তুমি যেন দুঃখ পেলে মনে হচ্ছে?—কবি শুধোলেন।

হ্যাঁ বন্ধু,—জীবন মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, সারা-জীবন আমি একটা প্রবাদের পূর্ণতার অপেক্ষায় আছি, তোমার কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে হয়েছিল আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা এতদিনে বুঝি সার্থক হল।

বুঝেছি,—কবি ম্লান হেসে বললেন, তুমি ভেবেছিলে আমার মুখের মধ্যে তুমি মহান পাথরের মুখের মিল খুঁজে পাবে। তাই আশাভঙ্গই তোমার দুঃখের কারণ।

কিন্তু এমন হল কেন?—জীবন প্রশ্ন করে, তুমি যা লিখেছ, তা কি সত্যি নয়?

সত্যের ইঙ্গিত আমার কবিতায় হয়ত আছে, কিন্তু আমার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার বাস্তব জীবনের যোগ নেই বন্ধু—দুঃখের হাসি হেসে কবি বলতে থাকেন, ওগুলো আমার স্বপ্ন, কিন্তু আসলে আমি আর পাঁচজনের মতই ভাল-মন্দে গড়া, সাধারণ মানুষ। নিজের জীবনে সত্য শিব, সুন্দরকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করতে আমি পারিনি। আমি মহতের স্বপ্ন দেখেছি মাত্র, নিজে মহৎ হতে পারলাম কৈ? আমার সারা-জীবনে সে অজস্র দীনতা।

কবির কণ্ঠে অনুতাপের সুর, দুচোখে বেদনাশ্রু। জীবনের চোখদুটিকেও শুকনো থাকতে দিল না।

সূর্যাস্তের কিছু আগে জীবনকে উঠতে হল। প্রতিদিন এই খোলা আকাশের নিচে সমবেত এক জনতার সামনে গল্পচ্ছলে সে সুন্দর সুন্দর কথা বলে। তার এই সভায় দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে, মুগ্ধ হয়ে শোনে তার কথা। কবির হাতে হাত দিয়ে জীবন হাঁটতে শুরু করল। তাকে যে তাদের সামনে যেতেই হবে। নিজের দুঃখ নিয়ে কালক্ষেপের সময় কোথায় তার!

এক নির্জন, শান্ত, প্রাকৃতিক পরিবেশে সভা বসেছে। সবুজ ঘাস যেন গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে, দূরে পাহাড়ের চূড়ায় জমতে শুরু করেছে কুয়াশা। বড় বড় গাছগুলো বাতাসে দুলছে। সূর্যের শেষ রশ্মি যেন আবির ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে।

জীবন তার বক্তব্য শুরু করল। তার কথা-গুলো যেন ছন্দোবদ্ধ নির্ঝরিণীর মত আপনা থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। অন্তর দিয়ে যে সত্য সে উপলব্ধি করেছে তাই সে বলছে, এতটুকু জড়তা নেই, বাহুল্য নেই। তার কথার সঙ্গে তার চিন্তাধারা একসূত্রে গাঁথা। খাঁটি মুক্তো যেন গলে গলে পড়ছে তার কথার সঙ্গে।

জীবনের কথা শুনতে শুনতে কবির দুচোখ সজল হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কবিতায় অনেক ভাল ভাল কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু এই মানুষটির কথা কত সুন্দর, কত মহৎ! অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি প্রতিভাত হয়েছে দূরে পাথরের মুখের ওপর; অল্প অল্প কুয়াশা জমে মনে হচ্ছে যেন শুভ্রকেশ এক মূর্তি—জীবনের মাথা ভর্তি তুষারশুভ্র চুলের মতই সুন্দর।

ঠিক ঐ সময় অন্তরের আবেগমথিত একটা কথা বলতে গিয়ে জীবনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মুখে ফুটে উঠল এক অপূর্ব দীপ্তি; দয়া, মমতায় ভরা এক স্বর্গীয় জ্যোতি। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কবি যেন মূক হয়ে গেলেন। পর মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি চিনেছি, আমি চিনেছি তোমাকে! বলেই সে প্রণতি জানাল জীবনকে। জনতার দিকে ফিরে বলল, দেখ, দেখ, ঐ পাথরের মুখের সঙ্গে এর মিল অন্তরে-বাইরে। ইনিই ঐ মুখের প্রতীক—আমাদের প্রবাদের সেই মহাপুরুষ!

অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখল সত্যিই তো, দুটো মুখ যেন এক হয়ে গেছে—অপূর্ব জ্যোতিতে ঝলমল করছে পাথর আর মানুষের মুখ। সকলে একত্রে মাথা নত করল।*

* বিশ্ব সাহিত্যের একটি গল্পের ছায়ায়

ছবি : সন্তোষ গুপ্ত

## দুর্ভাগ্যের বজ্র-পাঞ্জা আমাদের পিষে ফেলতে পারে... যে-কোন দিন, যে-কোন সময়! আপনি কি সুরক্ষিত?

আপনি রোজই কাগজে পড়েন— 'বন্দুক দেখিয়ে রেস্তোরাঁ লুঠ!' 'ব্যাঙ্ক ডাকাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি!' 'দপ্তরে অগ্নিকাণ্ড!' কিম্বা শোনেন, কাল যাঁর সঙ্গে খানা খেয়েছিলেন, আজ তিনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!

আপনার ধারণা এ সব অন্যদেরই হয়, আপনার নিজের কখনও হতে পারে না। কিন্তু হতে পারে! আপনি তৈরী থাকেন না! ফলে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ··· সবদিক থেকে আপনি পিষে যান।

এই সব আচম্‌কা বিপদের ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে নিউ ইণ্ডিয়া আপনার জন্যে তৈরী রেখেছে— সবচেয়ে বেশী রকমের বীমার সম্ভার। আর প্রিমিয়াম? আপনি যে নিরাপত্তা পান তার পুরো মূল্যের সামান্য একটু অংশ!

আজই আপনার কাছের নিউ ইণ্ডিয়া অফিসে আসুন বা চিঠি লিখুন। আপনাকে বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমরা সদাপ্রস্তুত।

NEW INDIA ASSURANCE
A subsidiary of the General Insurance Corpn. of India

নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স
কত কম দিয়ে···কত বেশী সুরক্ষা

Contour Ads-NIA-962B/83/Ben/R

# কিশোর মনের প্রাঙ্গণে

কিশোর জীবনের অনেক সমস্যা—অনেক বেদনা। এসব কথা নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের স্থান হবে এই প্রাঙ্গণ। এ বিষয়ে আমরা এখানে নিজস্ব মতামত পেশ করব। প্রয়োজনে অভিজ্ঞদের মতও শোনাব। এ পাতা সম্পাদকীয় বা চিঠিপত্রের পাতা থেকে স্বতন্ত্র। খেলার মাঠে আমাদের যে মুক্তি, যে অসংকোচ প্রকাশ—এ প্রাঙ্গণেও তাই।

এক একটি সমস্যা নিয়ে আমাদের মত মতান্তর একাধিক সংখ্যাতেও চলতে পারে। আমরা প্রতি সংখ্যার জন্য প্রাপ্ত চিঠিগুলির থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি চিঠি এ পাতায় প্রকাশ করব। সেরা তিনটি চিঠির লেখক-লেখিকাকে আমরা পনের টাকা করে পুরস্কারও দেব। চিঠি লিখবার সময় খামের ওপরে 'কিশোর মনের প্রাঙ্গণে' কথাটা লিখতেই হবে। ঠিকানা তার তলায়। চিঠি স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পিঠে লিখতে হবে। চিঠি সাধারণভাবে পাঁচশ শব্দের মধ্যে হওয়া দরকার। চিঠি শুধু আবেগে উচ্ছল হলে চলবে না—যুক্তি চাই। সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই।

অভিভাবকেরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে তাঁদের লেখা সেরা হলেও পুরস্কার দেওয়া হবে না।

## এ যুগের কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল

অধিকাংশ অভিভাবক শিক্ষক ও বয়স্ক মানুষ সমস্বরে চিৎকার করেন যে এ যুগের কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নীতিবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা তো কমেছেই, তারা কোন রকম রীতি-নীতি মেনে বড় হয়ে উঠছে না। আজকের সামাজিক অস্থিরতার অনেকখানির দায়িত্বই তাদের। বয়স্করা শিউরে উঠছেন এই ভেবে যে, আজ যারা এমন উচ্ছৃঙ্খল, আগামী দিনে যখন তারা যৌবনবান হয়ে উঠবে, সেদিন দেশের দশা কি হবে? সমাজ কোথায় যাবে?

প্রশ্ন করলাম, কোথায় তারা উচ্ছৃঙ্খল?

উত্তপ্ত বৃদ্ধ বললেন, কোথায় নয়? প্রথমেই বাড়ির কথা ধরুন। ওরা বড়দের মানে না। তাদের অভিজ্ঞতার কথা গ্রহণ করতে চায় না। বলে ওল্ড ফুলস। ওরা পারিবারিক শাসন মানতে চায় না। গুরুজনদের প্রতি ভক্তিটক্তিকে ওরা ভাবে পিছিয়ে থাকা—গ্রাম্যতা। এমন কি মশাই বয়সের সম্মানটুকু দিতে চায় না। ভাবে ইয়ার।

আমি বললাম, এ কথা সর্বৈব সত্য কি!

অন্যজন বললেন, ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য। তারাও অন্যদের কাছে পায় বিদ্রূপ। ওরা বলে অড ইজ মড—উদ্ভট হওয়াই আধুনিকতা। এজন্য সাজ-পোশাকে ওরা উদ্ভট, আবার বিচারে আরও বেশি। ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ির নানা ধরনের কাজ করা, পরিবারের সকলকে সাহায্য করা, বাজার করা, প্রয়োজনে যে কোনভাবে সংসার ও অভিভাবককে সাহায্য করায় তাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এর ফলে সব পরিবারেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। পরিবারে অশান্তি জমছে।

আর একজন বললেন, মশাই এরা কি স্কুল-কলেজেও সুশৃঙ্খল? রাস্তায় যখন যায় হুল্লোড় আর বেলেল্লাপনা চূড়ান্ত। কথাবার্তাতেও শালীনতা নেই। শিক্ষার পরিমণ্ডলেও কি কোন রীতি-নীতি মানছে? ক্লাসে বেড়াল ডাকা, মাস্টারমশাইকে বেইজ্জত করা, পরীক্ষার হলে বেপরোয়া টোকাটুকি, ক্লাসের বাইরে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অসম্মান—পরীক্ষা বয়কট, ঘেরাও, কি নয় মশাই! কোথায় নিজেকে গড়ে তোলা? ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা?

আর একজন বললেন, ছেড়ে দিন পরিবার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা। খেলার মাঠ, সিনেমা হল, থিয়েটার শো কোথায় কিশোরদের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখেছেন আপনি।

একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার ছিলেন ওঁদের দলে। তিনি বললেন, আপনি আবার কাগজের লোক। তবে এখন তো রিটায়ার করেছি। অত ভয় পাই না। তাই বলছি। আমরা তো স্বদেশী আমলেও দেখেছি। ঐ টোগরা বল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, গোপীনাথ—এদের বয়স কত ছিল? সবাই তো কিশোর—Teen-ager, কিন্তু আজ? জানেন, এই কলকাতা শহরে যত পকেটমার আছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরী! না মশাই এরা গরীব বলে এতে আসেনি। অনেকের বাবা বড়লোক। মা-বাবা জানেও না ছেলেমেয়ে কি করে। সমাজবিরোধী কত কাজে কিশোররা লিপ্ত জানেন? এদের মধ্যে কত ভাগ নানা রকম নেশায় জড়িত!

পুলিশ অফিসার থামতেই এক অধ্যাপক বলে উঠলেন, আর একটা কথা বলি আপনাকে। আমাদের আমলে স্কুলে-কলেজে আমরা নিজেরা অনুষ্ঠান করতাম, গাইতাম, অভিনয় করতাম। আর আজ কি হয় জানেন? বিখ্যাত শিল্পীকে অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনে গান শুনি আর তার তালে তালি দি বা নাচি। ছ্যাঃ মশাই! তোদের মধ্যে থেকে তা হলে শিল্পীর জন্ম হবে কিভাবে? তোরা কোথায় প্ল্যাটফরম পাবি?

ওঁরা আরও বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পার্কের কোণে কোলাহল উঠল। দেখলাম একদল কিশোর মারামারি শুরু করেছে। কারণ বুঝলাম না। ওঁরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। পুলিশ অফিসার বললেন, পালান মশাই। বলা যায় না, বোমবাজিও হতে পারে। না হলেও পরে পুলিশে টানাটানি করবে। দেখছেন তো কিশোরের জ্বালা!

শুনলাম। দেখলামও। কিন্তু এ তো এক তরফ! এ বিষয়ে কিশোরদের নিজেদের কি বলবার কিছু নেই? আমরা এ বিষয়ে কিশোরদের নিজস্ব বক্তব্য জানতে চাই—ঐ বৃদ্ধদেরও জানাতে চাই।

কিশোর মনের প্রাঙ্গণে

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____________________

বয়স ____________ শ্রেণী ____________

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ____________________

____________________

____________________

স্বাক্ষর ____________________

# সন্তোষ সিনহা ঃ যন্ত্রসংগীতের বিস্ময়

বিনোদ কুমার

বিহারের ছাপরার অন্তর্গত ভগবান-বাজার। ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড ফায়ার ইনসিওরেন্স-এর স্থানীয় ব্রাঞ্চের ম্যানেজার এ. এম. পি. সিনহার বাড়ি। একদিন ঐ বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেল বোম্বাই-এর নামী চলচ্চিত্র পরিচালক অমিতাভ দাসকে। সঙ্গে আরও লোকজন। অমিতাভবাবু শ্রীসিনহাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ আপনার ছেলে সন্তোষের জীবনী নিয়ে আমি একটা ছবি করতে চাই। হিন্দী ও বাংলা—দুটো ভাষাতে হবে ছবিটি। আমি চেষ্টা করব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করার। এ বিষয়ে আপনার অনুমোদন চাই। শ্রীসিনহা তো শুনে অবাক। বললেন ঃ সন্তোষ আমার ছোট ছেলে। বছর পনের মাত্র বয়স। দশম শ্রেণীতে পড়ে। তাকে নিয়ে আপনারা ছবি করতে চাইছেন কেন ?

তোমাদের মনেও নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে ঃ সত্যিই তো, কে এই সন্তোষ সিনহা। পনের বছর মাত্র বয়েস তবুও তার জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র করতে চাইছেন একজন নামী পরিচালক। এস, তবে আমরা এই কিশোরের আত্মপ্রকাশের প্রথম দিনের কথা দিয়ে পরিচয় শুরু করি।

১৯৭২ সালের ১৫ আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ। ছাপরার (বিহার) মহেন্দ্র মন্দির অডিটরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন নব-যুবক পরিষদ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। নামজাদা শিল্পীরা একে একে স্টেজে উঠে সঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করছেন। আর স্টেজের এক কোণে বসে বছর তিনেকের এক ছোট্ট ছেলে একাগ্র হয়ে লক্ষ্য করছে এসব। শ্রোতাদের অনেকেই এই ছোট্ট ছেলেটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠছে। এমন সময় লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল ঃ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী, আপনাদের সামনে আমরা এবার নিয়ে আসছি এক শিশুশিল্পীকে। নাম সন্তোষ সিনহা। বয়স তিন বছর। সন্তোষ আপনাদের ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনাবে।

নির্ভয়ে স্টেজের মাঝখানে হেঁটে এল শিশুটি। কিন্তু ব্যাঞ্জো বাজানোর আগে শিশুটি আবেদন জানাল গুদাই মহারাজের কাছে তার সঙ্গে তবলা বাজানোর জন্য। তবলা বাদক হিসেবে গুদাই মহারাজের খ্যাতি ভারতজোড়া। তিনি মনে মনে হাসলেন একটু তারপর রাজী হয়ে গেলেন সন্তোষের সঙ্গে তবলা বাজানোর জন্য।

যন্ত্রের ওপর খেলে চলল ছোট্ট শিল্পীর হাত। সঙ্গীতের সূক্ষ্ম মূর্ছনাও তার হাতে মধুরতর হয়ে বেজে উঠল। প্রথমে রাগ দরবারী, পরে মালকোষ। বাজানো শেষ হলেই আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন গুদাই মহারাজ। বললেন ঃ একদিন তুমিই দেশে বিদেশে ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গৌরব বাড়িয়ে তুলবে।

সকলের মুখে মুখে সেদিন এই শিশু-শিল্পীর কৃতিত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই থেকে আজও সে পেছনে ফিরে তাকায়নি।

সঙ্গীতে সন্তোষের অনুরাগ হয়ত মায়ের থেকে পাওয়া। মা আখৌরি মাধুরী সিনহা বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ৺ফণিভূষণ সান্যালের কাছে দীর্ঘদিন সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। ফলে শৈশবেই সঙ্গীতের পরিমণ্ডল পেতে অসুবিধে হয়নি সন্তোষের। তবে বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তার একটা সহজাত অনুরাগও ছিল। খেলার সঙ্গীদের নিয়ে খেলনা নিয়ে না মেতে শৈশবেই সে বাদ্যযন্ত্র নাড়াচাড়া করেছে।

একদিন তার দাদা একটা ব্যাঞ্জো কিনে

আনল। সন্তোষের আনন্দ আর ধরে না। কোনরকমে ব্যাঞ্জোটা হাতে পেয়ে তবে শান্তি। তারপর থেকে ঐ ব্যাঞ্জো বাজানোটাই তার সর্বক্ষণের খেলা হয়ে দাঁড়াল। তখন কেউ বোঝেনি এই শিশুর হাতেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী অপূর্ব মূর্ছনা লাভ করবে। ১৯৭২-এর ঐ স্বাধীনতা উৎসবের ক্ষণে এই শিশুশিল্পীর সাধনা সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল।

ক্রমে সন্তোষের কৃতিত্বের কথা ছাপরা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল—এমনকি বিহারের রাজধানী পাটনাতেও। পাটনার সায়েন্স কলেজের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান হল সন্তোষ সিনহাকে। সেটা ১৯৭৩ সাল। এবারে শুধু মুগ্ধ শ্রোতার প্রশংসাই নয়, সেইসঙ্গে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করল সন্তোষ। স্বর্ণপদক দিলেন পাটনা সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ। আরও সৌভাগ্য অপেক্ষা করেছিল সন্তোষের জন্য। পাটনার এই অনুষ্ঠানের পরই সেখানকার রেডিও স্টেশন থেকে আমন্ত্রণ পেল সে। ফলে আরও প্রশংসা জুটল, আরও অনেক গুণগ্রাহী প্রিয় শিল্পীর আসনে বসালেন তাকে।

ঐ বছরই ৪ মে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে সন্তোষকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী লোচন দত্ত এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী উখালিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী আর. ডি. ভাণ্ডারী। সন্তোষের কৃতিত্বে এতই মুগ্ধ হলেন তিনি যে তাকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন রাজভবনে।

১৯৭৩-এর ৩০ জুলাই, সন্তোষের জন্মদিনে ছাপরাবাসীদের পক্ষ থেকে সন্তোষকে নাগরিক সংবর্ধনা জানান হল। চার বছরের একটি শিশুর জন্য এধরনের নাগরিক সংবর্ধনা জানানর ব্যবস্থা এর আগে কোথাও হয়েছিল বলে জানা নেই। হবে না-ই বা কেন? এই ছোট্ট শিল্পী যে এরই মধ্যে ছাপরার নাম ছড়িয়ে দিয়েছে দিকে দিকে। এমন কজনই বা পারে!

১৯৭৪-এর ২ অক্টোবর। এক হিন্দী দৈনিকের প্রকাশ উপলক্ষে মজঃফরপুরে আয়োজিত হয়েছে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন তখনকার রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র এবং বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর। অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ঐ ছোট্ট সন্তোষই সকলের মন কেড়ে নিল। বিশিষ্ট অতিথিরাও মুগ্ধ। রেলমন্ত্রী সন্তোষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন এক হাজার টাকা, আর মুখ্যমন্ত্রী দিলেন পাঁচশো টাকা। শুধু তাই নয় ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যাতে পাশ্চাত্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেজন্য রেলমন্ত্রী এই শিশুশিল্পীকে সরকারি খরচে বিদেশে পাঠানর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৭৬-এর ১৮ নভেম্বর বিহার সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সোনেপুরের হরিহরক্ষেত্রে এশিয়ার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করলেন। সন্তোষ অংশগ্রহণ করল এবং স্বর্ণপদক ও বিপুল সম্মান লাভ করল।

এরপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করল সন্তোষ। অনেক জ্ঞানীগুণী শিল্পী এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে সম্মান জানালেন। তাঁদের সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এই অল্প বয়সে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীতে এমন দক্ষতা আর দেখা যায়নি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস সন্তোষ আরও বড় শিল্পী হবে। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ডঃ সুনন্দা পট্টনায়ক বললেন: আমি ছত্রিশ বছরের সাধনায় যা রপ্ত করেছি, সন্তোষ শৈশবেই তার ওপর দখল এনেছে।

এখন সন্তোষ পনের বছর বয়সের এক কিশোর। ছাপরা হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। সন্তোষের ইচ্ছে নিজের সঙ্গীত প্রচেষ্টাকে সে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নয় দেশের দশের কল্যাণের কাজে লাগাবে। তাই সে সৎ উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

শুবুর কথায় ফিরে যাই আবার। আলাপ আলোচনার পর সন্তোষের বাবা রাজী হলেন, বলাবাহুল্য আনন্দিতও হলেন। সন্তোষের জীবন ও প্রতিভা নিয়ে এই চলচ্চিত্রের প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই হয়ত তোমরা এই কৃতী কিশোর জীবন দেখবে রুপোলী পর্দায়, জানতে পারবে তার প্রতিভা আর সাধনার আরও নানান কথা। □

অনুবাদ : দেবীদাস আচার্য

## অপরূপ রাতে
### সুনির্মল চক্রবর্তী

নানা কাজের চাপে যখন
দিন গিয়েছে থেমে
রাত্রি এল নেমে।
আকাশ জুড়ে তখন শুধু
হাজার তারার মেলা,
কী অপরূপ খেলা!
জানলাতে মুখ দিয়ে বুবুন
দাঁড়িয়ে ছিল একা,
হঠাৎ হল দেখা—
কার সঙ্গে জানো তা কি?
একটি তারার সাথে,
সেই অপরূপ রাতে।
ইচ্ছে হল খেলবে খানিক
ছোট্ট সে নীল তারা,
পেরিয়ে আকাশ পাড়া
সেই তারাটি হঠাৎ কখন
পড়ল যে হায় খসে,
কে জানে কার দোষে!
উদাস নয়ন • জানলাতে মুখ
রইল বুবুন বসে।

# জন এফ কেনেডি হাই স্কুলে

চিরঞ্জীব

নিউইয়র্কে গিয়ে কী কী দেখা উচিত ? অনেকেরই উত্তর হবে—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, রাষ্ট্রসংঘ ভবন এবং এই ধরনের অনেক কিছু। আমি বলব—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন শহরে আর একটি দর্শনীয় হল জন এফ কেনেডি হাই স্কুল। ওদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্টের স্মৃতিতে এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৭১-এ। এর আগে ওই দেশে সহস্র সহস্র নয় আরও বেশি স্কুল হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে ব্রনক্সের ৯৯ টেরাস ভিউ এভিনিউয়ের আটতলা বাড়ির জন এফ কেনেডি হাই স্কুল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে।

মার্কিন সরকারের প্রচার বিভাগ ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন এজেন্সি ( সংক্ষেপে ইউ এস আই এ ) গত বছর যখন লস এঞ্জেলসে ওলিম্পিক প্রস্তুতির সঙ্গে ওদেশের খেলাধূলার উন্নয়ন সম্পর্কিত নানা বিষয় দেখার বন্দোবস্ত করেন, তখন ভ্রমণসূচীতে এই বিদ্যালয়টিকেও রাখেন।

নিউইয়র্কে সাংবাদিকতা নিয়ে পাঠরত কলকাতার চন্দন চ্যাটার্জিকে হঠাৎ পেয়ে যাই। চন্দন চমৎকার ছবি তোলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে যখন ওরই গাড়িতে রাষ্ট্রসংঘ ভবনের ধার দিয়ে চলেছি, তখন ( ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে ) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সদলে বিমানঘাঁটি থেকে আসছেন রাষ্ট্রসংঘে। নিউইয়র্কের একপ্রান্তে এই ব্রনক্সে পৌঁছতে আধঘন্টারও বেশি লাগল। বিরাট এলাকা জুড়ে জন এফ কেনেডি হাই স্কুল। আটতলা বিদ্যালয় গৃহটি যত না বড়, তার তিন-চারগুণ জমি জুড়ে নানা ধরনের খেলার মাঠ। সাদা সার্ট এবং নেভি ব্লু টাউজার্স বা স্কার্ট এদের পোশাক। মাঠে যেমন ছাত্রছাত্রীরা, তেমনি টিফিনের সময় অনেকে বেরিয়েছে। স্কুলের প্রবেশদ্বারে কঠোর প্রহরা। পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঢুকতে হয়। অন্যদের প্রবেশে চাই যথাযোগ্য অনুমতিপত্র। সমস্যা দেখা দিল সঙ্গী চন্দনকে নিয়ে। প্রতিটি গেটে আমার সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে, আমি পৌঁছলেই যেন অধ্যক্ষের ঘরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। চন্দনও জার্নালিস্ট, সে তার পরিচয়পত্র দেখাতে আর অসুবিধা হয়নি।

খেলাধূলা আমার বিষয় হলেও, সুযোগ পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষত অধ্যক্ষ রবার্ট আর মাস্ত্রুজ্জির কাছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক দেখার অনুরোধ করি। সুদূর ভারত থেকে এসেছি জেনে তিনি নিজের সব কাজ বন্ধ রেখে কয়েকটি ক্লাস দেখালেন এবং বিভাগীয় প্রধানদের অনুরোধ করলেন —সব কিছু দেখানোর। অধ্যক্ষ মাস্ত্রুজ্জি বেশ গর্ব করেই বললেন, আপনার দেশ ভারতের ছাত্রছাত্রীও আছে এখানে। ওদের দেখাও পেতে পারেন। মাস্ত্রুজ্জি বললেন : আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কেমন সে বিচার করবে দেশ ও সরকার। তবে গত দশ বছর দেশের সমস্ত সেরা পুরস্কার পেয়ে আসছে এই বিদ্যালয়। তবে লেখাপড়ায় বিদ্যালয়টি যাই করুক, ওর বেশি গর্ব এখানে সাদা-কালোয় ভেদ নেই। সারা বিশ্বের নানা বর্ণের, নানা জাতির ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি বসে পড়াশুনা করে, কোনরকম ভেদাভেদ নেই।

মাস্ত্রুজ্জি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকেই অধ্যক্ষ। ব্রনক্সের এই অঞ্চলের আশেপাশে তখন নিত্য রাহাজানি, খুনখারাপি চলত। দৌরাত্ম্য ছিল সমাজবিরোধীদের। কিন্তু প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে, টিফিনের অবসরে বা ছুটির পরে ছাত্রছাত্রীরা ফেস্টুন ও প্লাকার্ড নিয়ে মিছিল বের করত। মিছিলে কোন শ্লোগান ছিল না। মিছিল যান চলাচল বন্ধ করত না। মিছিল পথচারীদের অসুবিধায় ফেলত না। ফেস্টুন ও প্লাকার্ডে লেখা থাকত—আমরা আপনাদের ছেলে মেয়ে। আপনারা কেউ আমাদের দাদা, কেউ বাবা, কেউ কাকা। আপনারা কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলে আমরা কোথায় যাব ! আপনারা এসব বন্ধ করুন। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলুন।

সরকার নানা আইন দ্বারা, পুলিশ দ্বারা যে কাজে সফল হতে পারেনি, তা করল জন এফ কেনেডি হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের অসংখ্য সেকশনে ছাত্রছাত্রী এখন ৫১০০। আগে সংখ্যা কিছু কম ছিল। অধ্যক্ষ মাস্ত্রুজ্জি বুক ফুলিয়ে বলেন, ১৯৭১ থেকে কত ছাত্রছাত্রী এখান থেকে বের হয়েছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবেন না—জন এফ কেনেডির ছাত্রছাত্রীরা খারাপ। কেউ বলতে পারবেন না পরবর্তী জীবনেও এরা কেউ সমাজবিরোধী কোন কাজ করেছে।

অধ্যক্ষ বললেন, কেনেডি যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়ে গিয়েছেন, আমরা তাই-ই রূপায়ণের চেষ্টা করছি। তিনি সারা বিশ্বকে মৈত্রীবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন, তিনি বলতেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে কেন ?

(চলবে)

লেখার শুরুতে যে প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি জন এফ কেনেডি হাইস্কুলের প্রতীক। ঐ স্কুলের খাতায়, পুস্তিকায় প্রতীকটি দেখা যায়। প্রতীকটিতে সাদা ও কালোর সমন্বয় রয়েছে।

স্কুলের অধ্যক্ষ মাস্ত্রুজ্জ ( ডাইনে )। আলোকচিত্র : চন্দন চ্যাটার্জি (নিউইয়র্ক)

# সন্ধানী

## শব্দচিন্তা

শব্দচিন্তা আসলে এক জাতের শব্দ ধাঁধা। এই শব্দ ধাঁধায় আমরা বাঙলা শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যের সন্ধান করব। বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ধাঁধায় নামলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। অতএব সোজা সেখানেই নামা যাক।

১ যে সব পশুর পঞ্চনখ (পাঁচটি করে নখ) আছে

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ক | ■ | ■ |
| ■ | ■ | গো | | ■ |
| | | কী | ■ | ■ |
| ■ | ■ | গ | | |
| ■ | ■ | কূ | ■ | ■ |

২. সর্বাগ্র বন্দ্য এক সৃষ্টি ছাড়া অমর্ত্য

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | | জা | | |
| | | য় | | ■ |
| ■ | | স্বো | | |
| ■ | | র | | ■ |
| | | প | | ■ |

৩. শরীরের শাস্ত্র-বর্ণিত পাঁচটি বায়ু ঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ | | ণ | ■ | ■ |
| ■ | | পা | | ■ |
| ■ | ■ | স | | |
| | | ন | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ব্যা | | ■ |

৪. পঞ্চনদ কিন্তু মূল অর্থে নদী ঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ত | | ■ |
| | | শা | ■ | ■ |
| ■ | | রা | | |
| | | ভা | | ■ |
| ■ | | ত | | ■ |

৫. একই ফুলের রং-বেরং-এর প্রজাতির নাম

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ক | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | কো | | | | ■ |
| ■ | | | ব | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ম | | ■ | ■ | ■ |
| | | | ল | ■ | ■ | ■ | ■ |

সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়।

**রুবি ভট্টাচার্য**

## চোখের ভুল

নিচের ছবিটাকে দুটি রেখা সমান্তরাল ভাবে ছেদ করেছে। কিন্তু মুশকিল হল, কিছুতেই বোঝা যাচ্ছেনা রেখাদুটি সরল-রেখা না বক্ররেখা। দেখতো তুমি পার কিনা। পারলেই উত্তর পাঠিয়ে দাও সাত দিনের মধ্যে।

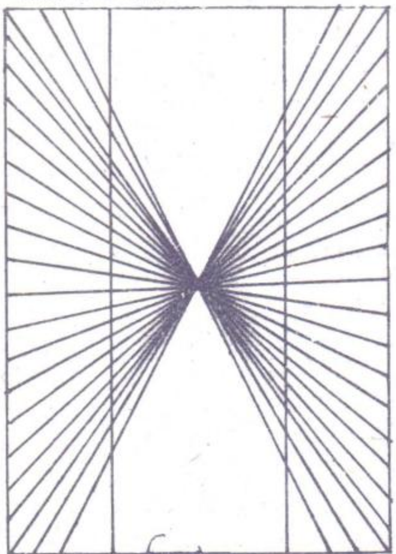

**শংকর মজুমদার**

## জানা প্রশ্ন ঃ অজানা উত্তর

[ বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন মাঝে মাঝেই আমাদের বিরক্ত করে। হঠাৎ একটা প্রশ্ন হাতের গোড়ায় এলে উত্তর পেতে হিমসিম খেতে হয়। প্রশ্ন নিয়ে এই খেলা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরম আকর্ষণীয়।

এ সংখ্যা থেকে শুরু হল 'জানা প্রশ্ন ঃ অজানা উত্তর'। এ সংখ্যায় ১০টি প্রশ্ন দেওয়া হল। উত্তর পাঠাতে হবে পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে। এক সংখ্যা অন্তর প্রথম পাঁচজন উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। অবশ্য তার আগেই তোমরা সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছ।

সঙ্গে কুপন অবশ্যই পাঠাবে। ]

১. সবচেয়ে হাল্কা ধাতু কি ?
২. কোন মাছ ডিম পাড়ে না ?
৩. কোন প্রাণী গা দিয়ে জল পান করে ?
৪. কোন পশু জল পান করে না ?
৫. র‍্যাডার যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে ?
৬. কোন খনিজ পদার্থ থেকে রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয় ?
৭. ডাচ মেটাল কোন কোন ধাতুর মিশ্রণ ?
৮. সন্ধ্যাতারা কোন গ্রহের নাম ?
৯. সবচেয়ে দ্রুতগামী মাছ কি ?
১০. স্যাকারিনের উৎস কি ?

**চন্দনকুমার নাগ**

কুপন

নাম ____________

বয়স ____________

অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

গ্রাহক সংখ্যা / যে স্টল থেকে বই কিনেছ তার ঠিকানা

স্বাক্ষর/তারিখ

# অটোম্যাটিক আলো

দিলীপকুমার পাঠক

লোডশেডিং হলে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে আলো জ্বালানর জন্যে কোথায় দেশলাই কোথায় মোমবাতি হাতড়াতে হয়। কোনও কোনও বাড়িতে emergency light আপনা-আপনি জ্বলে উঠতে দেখে সকলেরই মনে হতে পারে এমন একটা উপায় যদি সস্তায় করা যায় তবে আর দেশলাই হাতড়াতে হয় না। এখানে এমনই একটা সহজ উপায়ের কথা লিখছি।

রসায়নশাস্ত্রে একথা জানা যে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ওপর গ্লিসারিণ পড়লে আগুন জ্বলে ওঠে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে একটু কৌশল করে কাজে লাগাতে পারলে বিদ্যুৎ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে ওঠার একটা উপায় পাওয়া যাবে।

### প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

১. পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুঁড়ো—২৫ গ্রামের মত।
২. গ্লিসারিণ—১ আউন্স।
৩. ড্রপার—১টি।
৪. ২৮ গেজের সুপার এনামেল তামার তার—২০০ গ্রাম।
৫. লোহার বল্টু (½" ব্যাস, ২" লম্বা)—১টি।
৬. ১'×১' মাপের প্লাইউড বা অন্য কাঠের টুকরো—১টি।
৭. ১৫"×১' মাপের প্লাইউড বা অন্য কাঠের টুকরো—৩টি।
৮. প্যাকিং বাক্স থেকে খোলা লোহার পাত—৮"।
৯. পেরেক, স্ক্রু, তার ইত্যাদি।
১০. মোমবাতি।

### নির্মাণ পদ্ধতি

ছবি দেখলেই বোঝা যাবে কিভাবে তৈরি করতে হবে।

A একটি ১'×১' প্লাইউডের তক্তা। B, B দুটি প্লাইউড A-র ওপর লম্বভাবে দাঁড় করান আছে। C আর একটি প্লাইউডের তক্তা B, B-র ওপর A-র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসান থাকবে। C-এর ঠিক মাঝখান বরাবর একটি ছিদ্র (D) আছে। এই ছিদ্রটির ব্যাস এমন হতে হবে যে কাচের ড্রপারের কাচ অংশটুকু প্রবেশ করতে পারে, শুধু রবারের অংশটুকু ওপরে থাকবে। E একটি তড়িৎ চুম্বক। এই চুম্বকটি তৈরি করতে হবে লোহার বল্টুটির ওপর ২৮ গেজের তামার তার জড়িয়ে। এই কুণ্ডলীর দুটি প্রান্ত একটি প্লাগের মধ্যে দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে তারের কুণ্ডলীটির বৈদ্যুতিক-রোধ যদি যথেষ্ট না হয় তবে মেন ফিউজ হতে পারে। তবে এর জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আছে। একটা 100 watt বাতি মেন লাইনের সঙ্গে সিরিজে যোগ করে দিলেই হবে। F একটি ৮" লোহার পাত। এই পাতটি একটি কাঠের টুকরো G-র সঙ্গে লাগান। G টুকরোটি C-র ওপর শক্ত স্ক্রু দিয়ে বসান। F-এর অন্য প্রান্ত একটি স্প্রিং (H) দিয়ে এমনভাবে টান করে রাখা আছে যাতে লোহার পাতটি ড্রপারের রবার অংশটিকে C-র ওপর আটকানো অন্য একটি কাঠের টুকরোর (I) গায়ে চেপে রাখে। C-তে যে ছিদ্রটি (D) করা আছে তার মধ্যে দিয়ে ড্রপারের কাচ অংশটি C-র নিচের দিকে ঝুলে আছে। A-র ওপর একটি কাঠের চাকতিতে একটি মোমবাতি (J) দাঁড় করান আছে ড্রপারের ঠিক নিচে। কাঠের চাকতির ওপর তিনটি মোটা তার K, K, K দাঁড় করান আছে এবং একটি কাগজ (L) এই তারের মাথায় বসান আছে। এই কাগজের ওপর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া আছে।

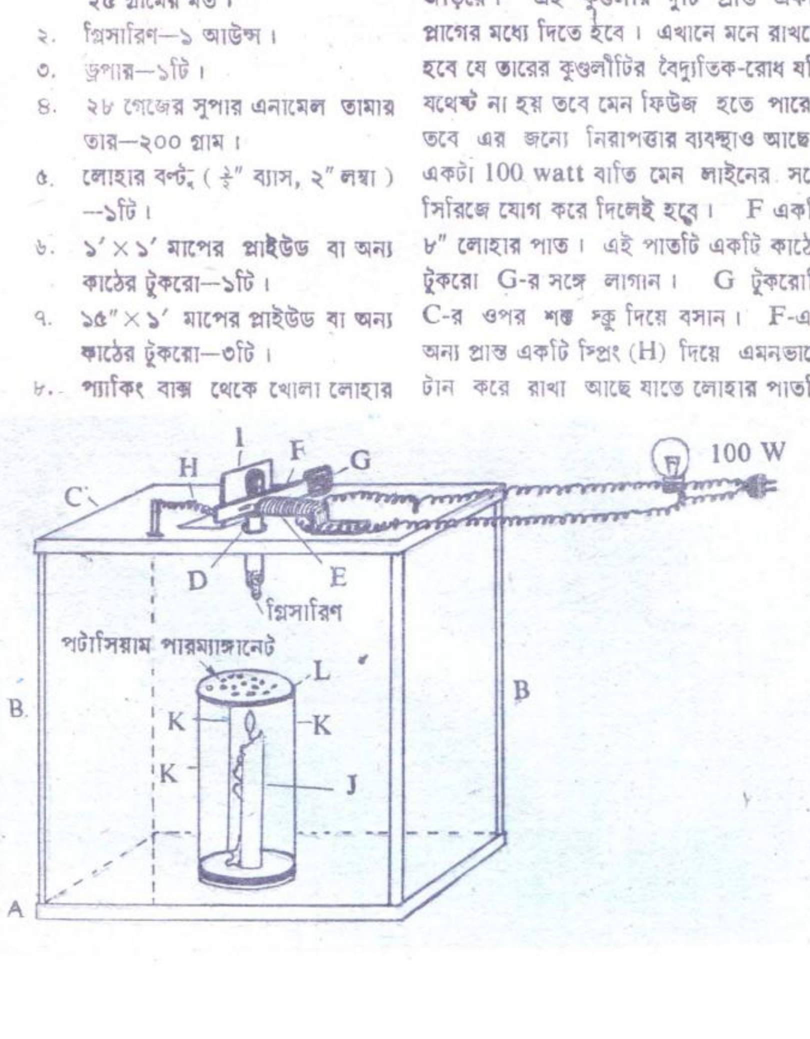


### কার্য পদ্ধতি

বিদ্যুৎ প্রবাহ যতক্ষণ চালু থাকবে ততক্ষণ বিদ্যুৎ চুম্বকটি সামনের লোহার পাতটিকে টেনে রাখবে। এই অবস্থায় ড্রপারটিতে গ্লিসারিণ ভরে নিতে হবে।

এখন যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তবে বিদ্যুৎ চুম্বকটি আর চুম্বক থাকে না, সামনের টেনে রাখা লোহার পাতটি স্প্রিং-এর টানে ছিটকে গিয়ে ড্রপারের রবার অংশটিকে চেপে দেবে। এর ফলে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিণ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ওপরে পড়বে। কয়েক সেকেণ্ড পরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কাগজে আগুন ধরে যাবে এবং কাগজের ঠিক নিচে রাখা মোমবাতিটি জ্বলে উঠবে।

> এ সংখ্যা থেকেই শুরু হল নিয়মিত বিভাগ হাতে কলমে' বিভাগটিতে তোমরা প্রতিবারই পাবে নিজেদের তৈরি করার মত একটি করে বিজ্ঞানবিষয়ক মডেলের বিবরণ। উৎসাহীরা বাড়িতে নিজে হাতে মডেলটি তৈরি করতে গিয়ে একদিকে পাবে যেমন আনন্দ এবং উৎসাহ, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরীর বহু খুটি-নাটি বিষয় সম্পর্কেও ওয়াকি-বহাল হতে পারবে।

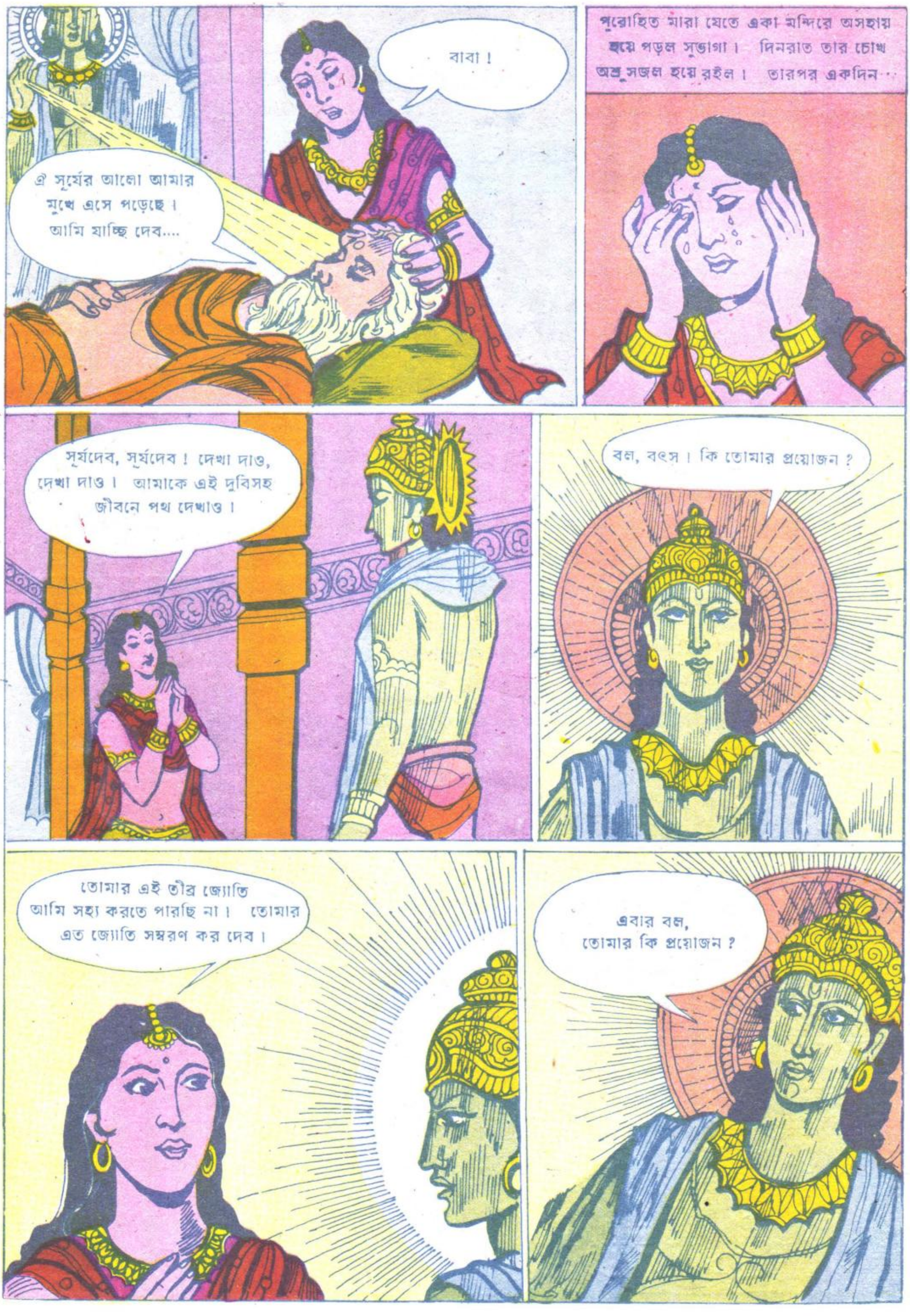
ঐ সূর্যের আলো আমার মুখে এসে পড়েছে। আমি যাচ্ছি দেব....
বাবা!
পুরোহিত মারা যেতে একা মন্দিরে অসহায় হয়ে পড়ল সুভাগা। দিনরাত তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে রইল। তারপর একদিন...
সূর্যদেব, সূর্যদেব! দেখা দাও, দেখা দাও। আমাকে এই দুর্বিসহ জীবনে পথ দেখাও।
বল, বৎস। কি তোমার প্রয়োজন?
তোমার এই তীব্র জ্যোতি আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার এত জ্যোতি সম্বরণ কর দেব।
এবার বল, তোমার কি প্রয়োজন?

আমি বড় একা। বাবা নেই, মা থেকেও নেই। পালকপিতা মৃত। স্বামী মৃত। পুত্র-কন্যা…
আমার আশীর্বাদে তুমি পুত্র-কন্যা পাবে। কিন্তু তাতে তোমার জীবন সংশয় হবে।
তা হোক। তবু আমায় সন্তান দাও। আমি তাদের লালন করতে চাই।
একি! অন্ধকার করে চলে গেলেন সূর্যদেব! তবে কি.... না সূর্যদেবের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না। আমার প্রণতি গ্রহণ কর সূর্যদেব।
এর পর কত দিন কেটে গেল। একদিন ঘুমের ঘোরে জেগে উঠল সুভাগা দুটি পুত্র-কন্যার 'মা-মা' ডাকে। সুভাগার জীবন তাদের 'মা' ডাকের আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। সে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরল।
মা-মা।
বাছারা! তোদের পেয়ে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। জানিনা, সূর্যদেব আমাকে কি বিপদের ইঙ্গিত করে গেলেন।
আগামী সংখ্যায়
এই গল্পের 'গায়েব-গায়েবী' পর্ব।

# শয়তানের চেলা

শহরের নামটা না হয় নাই বললাম। সে শহরের এক পাড়ায় থাকত চারটি ছেলে। তাদের দুষ্টুমির শেষ নেই। ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই, ঘুম থেকে ওঠার পর রাত্রে শোওয়া পর্যন্ত শুধুই দুষ্টুমি। বাপ-মা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বকা ছেড়ে দিয়েছিল। ইস্কুলে তাদের নাম কাটা গিয়েছিল। সবাই তাদের নাম দিয়েছিল শয়তানের চেলা।

শুনতে শুনতে ওদেরও জেদ চেপে গেল। এক নম্বর বলল, ভাই সব, আমরা শয়তানের চেলাই হব। মনে প্রাণে শয়তানের চেলা হতে হবে।

অন্যেরা বলল, খুব ভাল কথা। কিন্তু পথ কি?

এক নম্বর বলল, আমরা দিনের শুরুতেই শয়তানের নামে সিন্নি চড়াব। তারপর শয়তানের জয়ধ্বনি দিয়ে সেই সিন্নি নিজেরা খেয়ে দিন শুরু করব।

অন্যেরা আহ্লাদে তখনই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। তার সেই থেকে তারা নিত্য

শয়তানের নামে সিন্নি চড়ান আর জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু করল।

নিত্য জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে শয়তানের আসন টলে উঠল। শয়তান ছেলে চারটিকে কদিন খুব ভাল করে নিরিখ করলেন। মন্দ লাগল না। তবু চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ওদেরই বয়সী একটি ছেলের রূপ ধরে এসে বললেন, তোমরা কি করছ ভাই!

ওরা নিত্যদিনের মত ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাজারটা করে দিয়ে এসে (বাজার থেকে পয়সা মারা যায় বলেই ওরা বাজার করে —বাবা-মাকে সাহায্য করার জন্য নয়) সকলের পয়সায় একত্রে মুড়ি বাতাসা কিনে এনে একটা গামছায় ঢেলে শয়তানের নামে সিন্নি দেওয়ার আয়োজন করছিল। তাই বলল, আমরা শয়তানের পুজোর আয়োজন করছি।

শয়তানবেশী ছেলেটি বলল, বাঃ। খুব ভাল ত! আমিও শয়তানকে ভালবাসি। আমাকে তোমাদের দলে নেবে!

এক নম্বর বলল, কেন নেব না! শয়তানের পুজোয় কোন জাতভেদ নেই। এতে বামুনও লাগে না, মোল্লাও লাগে না। চাঁদা দাও আর আমাদের সঙ্গে বসে যাও।

ছেলেটি বলল, বাঃ। ভারি ভাল ত। এই নাও চাঁদা। এই বলে সে একটা পয়সা ফেলে দিল। আর মনে মনে ভাবল, দেখি তোমরা কেমন শয়তানের চেলা। যদি আমাকে ঠকাতে পার তবে বুঝব!

এক নম্বর পয়সাটা তুলে নিয়ে বলল, তোমরা বস। আমি এক্ষুণি এক পয়সার মুড়ি বাতাসা কিনে আনি।

তিন নম্বর বলল, চল, আমিও যাই।

এই বলে ওরা দুজন একটু আড়ালে আসতেই তিন নম্বর বলল, একি করলি। আমরা দিয়েছি পাঁচ পয়সা করে। ও দিল এক পয়সা। খাবে তো সমানই।

এক নম্বর হাসল। বলল, দেখই না মজাটা। ওর পয়সার মুড়ি যদি আমরাই খেতে না পারলাম, তবে আর আমরা শয়তানের চেলা হলাম কিসে!

তিন নম্বর আশ্বস্ত হল। এক নম্বরের ওপর ভরসা করা যায়। ওর যা কথা, তাই কাজ। অতএব কিনে আনা হল মুড়ি বাতাসা। মেশান হল একত্রে। তারপর সকলে ভক্তিযুক্তচিত্তে গোল হয়ে বসে হাতজোড় করে শয়তানের নামে জয়ধ্বনি দিল, জয় শয়তান, জয় শয়তান, জয় শয়তান। তারপর এক নম্বর বলল, এবার আমরা কি করব ভাই সব!

অন্য তিনজন বলল, এবার আমরা প্রসাদ খাব।

এক নম্বর বলল, ঠিক! কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা কি!

সকলে বলল, কি?

এক নম্বর বলল, আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমরা যে যেকটা পয়সা দেব, সে সেইকটা আঙুলে খাব।

ওরা তিনজন বলল, ঠিক ঠিক।

এক নম্বর বলল, বেশ খাওয়া শুরু কর।

ওরা পাঁচ আঙুলে মুঠোভরে মুড়ি বাতাসা মুখে পুরতে থাকল। কিন্তু বালকবেশী শয়তান দিয়েছে এক পয়সা। এক আঙুলে মুড়ি উঠবে কেন? মুড়ির স্তূপে আঙুল ঢোকালে দুপাশ দিয়ে পড়ে যায়। অতএব মুঠো মুঠো তুলে ওরা ততক্ষণে সব মুড়ি শেষ করে দিল, বালকবেশী শয়তান একটা মুড়িও মুখে তুলতে পারল না। তখন সে নিজমূর্তি ধারণ করে চারটি ছেলেকে আশীর্বাদ করল। আর বলল, হ্যাঁ! তোমরা যোগ্য শয়তানের চেলা। তোমাদের জয় হোক।

ধীরেন বিশ্বাস

ছবি : লাহিড়ী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-7896 IPPL IN

# আপনার নাক কতখানি উঁচু ?

যদি খুব বেশি হয়,
তাহলে

**পরিবর্তন**

আপনার জন্য নয়।
কারণ

পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা থাকে।

পরিবর্তনে সেই সমস্ত অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনই প্রকাশিত হয় যা আমাদের সমাজ-জীবনকে ব্যাহত করে।

পরিবর্তন আপনার কাছে সেই সব জ্ঞানের কথাই বলে যা দিয়ে আপনি বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করতে পারেন।

পরিবর্তন ভাবতে শেখায় দেশ ও মাটির কথা।

আমাদের স্বীকার করতে লজ্জা নেই পরিবর্তন খুব বেশি করে পড়েন ডেইলি প্যাসেনজাররা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, মহিলারা এবং সাধারণ চাকুরিজীবীরা; শিক্ষক, অধ্যাপক, তরুণ, উকিল, চিকিৎসক এবং শুনলে অবাক হবেন সাংবাদিকরাও।

আপনি যদি সমাজ-সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালি হন এবং নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবতে যদি লজ্জা না পান তাহলে পরিবর্তন আপনার পত্রিকা।

আপনি একা নন, আপনার সংগী প্রতি সপ্তাহে আমাদের দশ লক্ষ পাঠক।

---

পরিবর্তন : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২

KISHORE MON ‡ 16 April — 30 April 1984 ‡ Decl. No. 43/84 Dt -- 29/2/ 84 ‡ Rs. 3.00

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৭২